শোভা সেন

আমার উৎপল

অনুলিখন ও রচনা

অরূপ মুখোপাধ্যায়

শোভা সেন

আমার উৎপল

অনুলিখন ও রচনা

অরূপ মুখোপাধ্যায়

আমার উৎপল

আমার উৎপল

শোভা সেন

অনুলিখন ও রচনা

অরূপ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

ভারতীয় থিয়েটারের সেই অকুতোভয় ও বর্ণময় ব্যক্তিত্ব
উৎপল দত্তের স্মরণে

ভূমিকার বদলে

২০১৭ সালের ১৩ আগস্ট বাংলা থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী শ্রীমতী শোভা সেন প্রয়াত হয়। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শোভা সেনের জবানিতে 'আমার উৎপল' শিরোনামে একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে এই রচনা প্রকাশিত হয়। উৎপল দত্তের জীবনের সেইসব অকথিত, ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুলিখন এবং রচনা বর্তমান লেখকের। এই চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী কাহিনীর সিংহভাগ সংবাদপত্রের রবিবারের পাতায় পর্যায়ক্রমে ছাপা হয়েছিল।

'আত্মজা' প্রকাশনের তরুণ কর্ণধার অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে বাদবাকি রচনা সম্পূর্ণ করে এই নজরকাড়া 'আমার উৎপল' বইটি প্রকাশিত হল। এই বইতে সংযোজিত হল শোভা সেন সম্পর্কে বর্তমান লেখকের একটি নিবন্ধ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত দূরদর্শন সাক্ষাৎকার। আশাকরি বইটি পাঠকদের ভাল লাগবে।

অরূপ

বইমেলা, ২০২০

মুখোপাধ্যায়

সূচি

আমার উৎপল

১

উৎপল দত্তের সঙ্গে আমার কাগজের বিয়ে হয়েছিল ১৯৬১ সালের ২৯ মার্চ। সেদিন ছিল উৎপলের ৩২তম জন্মদিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও জাঁকজমক বা আড়ম্বর হয়নি। নিতান্ত ঘরোয়া এই রেজিস্ট্রির সময় খুব ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। শেক্সপিয়রের নাটকের সুবাদে উৎপল দত্ত তখনই ভারতবিখ্যাত। এর মধ্যে 'অঙ্গার' নাটকের বিপুল সাফল্য বাংলা মঞ্চে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু এই বিয়ের সংবাদ ব্যক্তিগত পরিধির বাইরে যায়নি। উৎপলের এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও ছিল না। 'অঙ্গার' নাটকের ৩০০ রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৬১ সালের মে মাসের প্রথমেই আমরা বোম্বাই যাই। সেখানে 'অঙ্গার'-এর একটি আমন্ত্রিত প্রযোজনা ছিল। এই শো-তে বোম্বাইয়ের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী এসেছিলেন। সকলেই উৎপলের নাট্যপ্রতিভা ও পরিচালনার তারিফ করেন। অভিনয়ের শেষে পৃথ্বীরাজ কাপুর তাঁর প্রশস্ত বুকে উৎপলকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি। সেই সময় বোম্বাইতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে আমাদের কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বোম্বাইয়ের বহু বিশিষ্টজনের সামনে তিনি উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঘোষণা করে দেন। তারপরই এই খবর পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংবাদে আমাদের আত্মীয়-পরিচিত এবং বন্ধুমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বন্ধুরা অনেকেই আমাদের যেমন অভিনন্দন জানান, তেমনি কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল।

কিন্তু আমি দীর্ঘ মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তির পর নতুন জীবন ফিরে পেলাম। ১৯৬১ সালের ১০ মার্চ দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল। পুরুষশাসিত সমাজে আমি ছিলাম লাম্পট্য, লাঞ্ছনা আর অবিচারের শিকার। কিন্তু স্বামীর অন্যায় অত্যাচার ও দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলাম আমি। তাই উৎপলের মতো সিংহহৃদয়, উদারচেতা স্বামীকে পেয়ে সব দুঃখকষ্ট ভুলে গেলাম। উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে জানতে পারতাম না, একজন স্বামী তার স্ত্রী বা জীবনসঙ্গীকে কতটা মর্যাদা বা সম্মান দিতে পারে। উৎপল প্রকৃত অর্থে নারীস্বাধীনতা ও সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'অঙ্গার' নাটক মঞ্চস্থ হল আর এই প্রযোজনার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তাঁর আশ্চর্য সুরসৃষ্টির জাদুতে এই নাটক আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এর আগে লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'নীচের মহল' দেখতে এসেছিলেন পণ্ডিতজি। নাটক হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ববরেণ্য শিল্পী উৎপলকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের পরের নাটকে সুর দিতে চাই, নেবেন?' উৎপল এই প্রস্তাবে আত্মহারা। তারপর রবিশঙ্করের সুরসৃজনে 'অঙ্গার' নাটকের সেই অনবদ্য জলপ্লাবনের সঙ্গীতমূর্ছনা। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই মণিকাঞ্চন- যোগ বিস্মৃত হওয়ার নয়।

তারপর 'ফেরারী ফৌজ' নাটকেও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত রবিশঙ্কর। উৎপলের প্রতিভা ও অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতজি এই নাটকেও অনবদ্য আবহ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। উৎপলের মতে, 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী রবিশঙ্করের ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের কুশলতা ও মৌলিকতা 'অঙ্গার'কেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখি, কিছুদিন আগে রবিশঙ্কর প্রয়াত হওয়ার পর

বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র নিয়ে কোনও আলোচনা হল না। এই নীরবতা কি স্বেচ্ছাকৃত না অজ্ঞতাপ্রসূত?

উৎপল দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৫২ সালে। আমি তখন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী ও অভিনেত্রী। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক ও অভাবনীয় সাফল্যের পর আই পি টি এ একটি শক্তিশালী আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। তারপর ১৯৪৬ সালের রক্তস্নাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নৌবিদ্রোহ, সারা ভারত রেল ও ডাক ধর্মঘট এবং দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং আই পি টি এ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ইতিহাসের সেই অগ্নিগর্ভ পালাবদল ও টালমাটাল সময় পার করে আমরা আবার ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ছাতার তলায় জড়ো হয়েছিলাম। এই সঙ্ঘে তখন ভারতবিখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকর্মী ও কলাকুশলীগণ উপস্থিত। সেই সময়ে, ১৯৫২ সালের ২৩ এপ্রিল শেক্সপিয়রের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে গণনাট্য সঙ্ঘ 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঙ্ক মঞ্চস্থ করেছিল।

অধ্যাপক নীরেন রায়ের তর্জমায় (উৎপল পরে লিখেছিলেন, 'ম্যাকবেথ'-এর এই অনুবাদ একটা অত্যন্ত কুৎসিত কদর্য অনুবাদ, কিন্তু আমরা সেই অক্ষম ও ভয়ানক অনুবাদ করতে বাধ্য হই, কেননা নীরেন রায় ছিলেন আমাদের শিক্ষক এবং পার্টির একজন তাত্ত্বিক নেতা।) উৎপলের পরিচালনায় 'ম্যাকবেথ' নাটকে আমি লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় রূপদান করেছিলাম। পরিচালক উৎপল স্বয়ং ম্যাকবেথের চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। উৎপলের ম্যাকবেথ চরিত্রে রূপদান দেখে শিশির ভাদুড়ী মহাশয় প্রচণ্ড প্রশংসা করেন। আমার লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয় পরিচালক উৎপলকে সন্তুষ্ট করেছিল। ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদে ওই ছোট একটি অংশের অভিনয় করে বুঝেছিলাম উৎপল দত্ত কত শক্তিশালী অভিনেতা ও পরিচালক। বিশেষত, শেক্সপিয়রের ধ্রুপদী অভিনয়কলা শিক্ষার জন্য এদেশে উৎপলের জুড়ি মেলা ভার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক এবং শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞ জেফ্রি কেন্ডালের কাছে উৎপল ততদিনে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পী।

তারপর ১৯৫৪ সাল। আমাদের পরিচিত একটি ছেলে এসে একদিন আমায় বলল, 'উৎপল দত্ত আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে, লিটল থিয়েটার গ্রুপ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাংলা তর্জমায় শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাট্য প্রযোজনা করতে চলেছে। আমাকে সেখানে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। সেই আহ্বান আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আর দেরি করিনি। একজন আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক ও শিক্ষকের কাছে। থিয়েটারের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শুরু হল। সেটাই প্রকৃত অর্থে আমার গুরুলাভ।

২

'ম্যাকবেথ' নাটকের মহলা শুরু হলে বুঝতে শুরু করলাম প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারের প্রস্তুতিপর্বের তপস্যা। তখন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে আমি লেডি ম্যাকবেথ। বাসে-ট্রামে মনে মনে বিড়বিড় করে পার্ট বলে যাচ্ছি। তখন আমার বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থা। সহযাত্রীরা ভাবছে এ নির্ঘাত একটা পাগল। মহলায় পরিচালক উৎপলের সামনে দাঁড়ালে বুক শুকিয়ে যায়। লিটল থিয়েটার গ্রুপের শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার খ্যাতি আগেই কানে গিয়েছিল। এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে লাগলাম। মহড়ায় এক মিনিট দেরি হলে রক্ষা নেই। গ্রুপের সম্পাদক অত্যন্ত কড়া মেজাজের দুর্মুখ রবি সেনগুপ্তের রোষের মুখে পড়তে হবে। উৎপলের বিশ্বাস ছিল, এইভাবে আগুনে পুড়ে পুড়ে থিয়েটারের খাঁটি সৈনিক গড়ে ওঠে। উৎপলের অসাধারণ শিক্ষায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছি।

থিয়েটারের মহলায় উৎপল সত্যিই ছিলেন বাঘের মতো। কোনও রকম বিশৃঙ্খলা আর কাজে অবহেলা তাঁর দু'চোখের বিষ। তখন তাঁর চণ্ডাল ক্রোধের জন্য সবাই থরহরি কম্প। অনেক পরে রবি ঘোষ একবার বলেছিল, থিয়েটারে উৎপলদা একেবারে মিলিটারি জেনারেল। তাঁর ওই বড় বড় অগ্নিদৃষ্টিকে সবাই যমের মতো ভয় পেত। ম্যাকবেথে রবির সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। পরে 'অঙ্গার' নাটকে রবি অসামান্য অভিনয় করেছিল। একবার 'অঙ্গার' নাটকের মহড়ায় ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে একটি চিৎকার করতে আমি সামান্য একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। উৎপল রাগে আমায় টর্চ ছুঁড়ে মেরেছিলেন। যদিও পরে বলেছিলেন, ওটা নাকি দেওয়ালে মেরেছিলেন। কিন্তু উৎপলের আপাত রূঢ়ভাষী, কঠোর মুখোশের আড়ালে ছিল একটি আমুদে, কৌতুকপ্রিয়, হৃদয়বান, স্নেহপ্রবণ মানুষ।

আমাদের 'ম্যাকবেথ' নাটকটা জমে গিয়েছিল। কলকাতার বাইরে, গ্রামেগঞ্জে, শহরতলিতে, শ্রমিকদের পল্লিতে এই নাটকের অসংখ্য শো হয়েছিল। এখানে বলি, ১৯৫১ সালেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় আমাদের প্রথম 'ম্যাকবেথ'-এর প্রযোজনা দেখে সাংবাদিক সরোজকুমার দত্ত একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অধিকাংশের অভিনয় নৈপুণ্য প্রথম শ্রেণী, এমনকি দুই এক জনকে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নট বলাও চলিতে পারে।' এই সময় আমাদের নাট্যদলের নামই হয়ে গিয়েছিল 'ম্যাকবেথ পার্টি'। তখন কলকাতার বাইরে সপ্তাহে তিন-চার দিন 'ম্যাকবেথ' নাটকের শো নিয়মিত হয়েছিল।

অনেক পরে, ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্ধকার অধ্যায়ে উৎপল আবার 'ম্যাকবেথ' নাটক প্রযোজনা করেছিলেন। তখন আমরা পিপলস্ লিটল থিয়েটারের সদস্য। এবার অবশ্য শেক্সপিয়রের ওই কালজয়ী নাটক নিজেই অনুবাদ করে উৎপলের পরিচালনায় এই নাট্যাভিনয় হয়েছিল। উৎপলের এই ভাষান্তর ছিল বিশুদ্ধভাবে শেক্সপিয়র অনুসারী। আমি এবারও লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রটি পেয়েছিলাম। তবে আমার মতে, এই তিন দফার মধ্যে গুণগত উৎকর্ষের বিচারে এল টি জি-র 'ম্যাকবেথ'ই আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। উৎপলের ব্যাখ্যা ছিল, জরুরি অবস্থার (১৯৭৫) স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী ম্যাকবেথকে দেখানো।

এই সময়ে একটা ঘটনায় উৎপলের বিষয়বুদ্ধি সম্পর্কে আমার চোখ খুলে গেল। যাদবপুরে 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি প্রযোজনা হয়ে যাওয়ার পর দলের তরফে উদ্যোক্তাদের কাছে টাকা চাওয়া হল। তখন তাঁরা জানালেন, টাকা তো আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। দলের সম্পাদক তখন টাকার রসিদ দেখাতে বলেন। উদ্যোক্তারা সে সময় উৎপলের স্বাক্ষর করা ৭৫ টাকার একটি প্রমাণপত্র পেশ করলেন। আমাদের তো মাথায় হাত। কিন্তু এতে সকলে বুঝে গেল যে বহু আগে উৎপল ৭৫ টাকায় এই শো হবে বলে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। একটা এত বড়, পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রযোজনা-খরচ মাত্র ৭৫ টাকা? কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না। উদ্যোক্তারা এই রসিদকে চুক্তিপত্র বলে দাবি করলেন। এমনই ছিল উৎপল দত্তের বিষয়বুদ্ধির দৌড়! তারপর সারাজীবন উৎপলকে আর কখনও অর্থকরী ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া যায়নি। আমি ঘটনাক্রমে লিটল থিয়েটার দলের সাংগঠনিক বিষয়ে আরও জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। তখনও কিন্তু নাটকের গুরুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিনি। উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ের পরে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের প্রথম বিদেশযাত্রা। এই সফরে সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে আমরা প্রথমে যাই তাসখন্দ ও মস্কো। তারপর জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে। সেই যাত্রায় মস্কো থেকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বহু বিখ্যাত নাটক দেখেছিলাম। ব্রেখট প্রতিষ্ঠিত বার্লিনের বিশ্ববিখ্যাত অনুসম্বল প্যারি কমিউনের দিনগুলি নিয়ে ব্রেখটের 'ডী-টাগে ডে অর কমুনে' নাটক দেখা একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সেবার জার্মানিতে গিয়েই আমাদের আর্জি ছিল, ব্রেখটের বিধবা পত্নী প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেলের সাক্ষাৎকার। ইতিমধ্যে খ্যাতনামা জার্মান নাট্যকার ড. ফন কুবার সঙ্গে উৎপলের দীর্ঘ একান্ত আলাপচারিতা ঘটেছিল। একদিন তাঁর জন্য সামান্য কিছু উপহার নিয়ে থিয়েটারের কলাকুশলীদের ক্যান্টিনে

অপেক্ষা করতে লাগলাম। এর আগে 'মাদার কারেজ' ছবিতে তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় দেখেছিলাম। একটু পরে হেলেনে ভাইগেল এলেন। আমাদের টেবিলে বসে নিজেই পরিচয় করে নিলেন। সামান্য উপহার পেয়ে শিশুর মতো আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন। তখন উৎপল তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন কোনটি?' ভেবেছিলাম তিনি বলবেন, ব্রেখটের সঙ্গে বিবাহ। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল 'যেদিন ১৯৩২ সালে জার্মানিতে প্রথম মে দিবসের মিছিলে হেঁটেছিলাম।' উৎপল এই জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমারও গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। উৎপল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

৩

সেবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে আমরা দারুণ উপকৃত হয়েছিলাম। আধুনিক রুশ থিয়েটারের দিকপাল পুরুষ কনস্তান্তিন স্তানিসলাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটারে তলস্তয়ের কয়েকটি প্রযোজনা আমরা দেখেছিলাম। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের প্রভাবশালী নাট্যব্যক্তিত্ব ভাসতানভের থিয়েটার দেখে উৎপল খুব অনুপ্রাণিত হয়। তবে উৎপল সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছিল বিশ্ববরেণ্য রুশ নাট্য-পরিচালক নিকোলাই অখলোপকভের সঙ্গে আলোচনা করে। আমরা অখলোপকভ পরিচালিত 'দি ওশান' নাটকটি দেখে দারুণ উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম। ধ্রুপদী রুশসাহিত্য এবং আধুনিক সোভিয়েত থিয়েটার সম্পর্কে উৎপলের বিশাল জ্ঞানের বহর ও গভীরতায় অখলোপকভ মুগ্ধ হয়ে যান। আমি এইসব আলোচনায় নীরব শ্রোতা।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে গ্রামসমাজের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সে দেশের যৌথখামার দেখতে গিয়ে অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একটি স্থানীয় কৃষক পরিবারে আমাদের আমন্ত্রণ ছিল। প্রথমে দেখলাম আঙুর খেত, তারপর আঙুরের রস থেকে পানীয় তৈরির ব্যবস্থা। এরপর গৃহস্বামীর আয়োজনে শুরু হল সমবেত অতিথিদের নিয়ে মদ্যপানের আসর। মোষের শিংয়ের আকারে পানপাত্র। এক চুমুকে খেতে হবে। কারণ পাত্র কোথাও রাখা যায় না। আমি ওই রসে বঞ্চিত। স্বাস্থ্যবান, বিশালদেহী বলিষ্ঠ রুশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপল পাত্রের পর পাত্র শেষ করছিল। পানে সে একটুও দমেনি। কী অদ্ভুত প্রাণশক্তি! পরিশেষে নানাস্বাদের বিভিন্ন রকমের গরম মাংস। অত সুন্দর মাংসের পদ জীবনে খাইনি। দিনটা খুব আনন্দে কেটেছিল।

১৯৬৪ সালে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপিয়রের চারশোতম জন্মোৎসব সারা দুনিয়ায় মহা আড়ম্বরে পালিত হয়েছিল। শেক্সপিয়রের জন্মস্থান ইংল্যান্ডের স্ট্যাডফোর্ড-অন-অ্যাভেনে এই যুগন্ধর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে সেই তারকাখচিত মহাসম্মেলনে ভারতের একমাত্র আমন্ত্রিত প্রতিনিধি ছিল উৎপল দত্ত। তবে লন্ডন শহর প্রদক্ষিণ ও ভ্রমণের জন্য নিযুক্ত আমাদের গাইড উৎপলকে বলেছিল, 'আপনি লন্ডন শহর সম্পর্কে যা জানেন, তাতে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।'

যদিও এর আগে উৎপল কখনও লন্ডন শহরে যায়নি। পৃথিবীর সব দেশ, সমস্ত বড় শহর ও রাজধানী এবং ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে উৎপল অনর্গল বলে যেতে পারত। শুধু বই পড়ে যে-কোনও বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এর আগেও মস্কো ছাড়ার আগে আমাদের দোভাষীকে লন্ডন শহরের এমন বিবরণ উৎপল দিয়েছিল, তাতে সে ভেবেছিল উৎপল নির্ঘাত বহুবার ওই শহর চষে ফেলেছে। দোভাষী আমায় সে কথা বলায় আমি তো হেসে বাঁচি না। আমি ওই রুশ দোভাষীকে বললাম, উৎপল এই প্রথম লন্ডনে যাচ্ছে। কিন্তু বই পড়ে ওই শহরের খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। এই কথা শুনে বিস্ময়ে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। উৎপল এইভাবে মানুষের সঙ্গে কৌতুক করতে ভালবাসত। এই মরশুমের লন্ডন পরিভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চিচেস্টারে শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' প্রযোজনা। প্রধান চরিত্রে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার। চিচেস্টার লন্ডন শহর থেকে আশি মাইল দূরে। কিন্তু এই প্রযোজনা দেখে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে হতাশ হলাম।

প্রথমত, ইয়াগো ও ক্যাসিও পার্ট ভুলে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, ওথেলোবেশী খ্যাতনামা লরেন্স অলিভিয়ারকে দেখে মনে হল যে তিনি খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। আমি হলফ করে বলতে পারি, এর চেয়ে নামভূমিকায় উৎপল- অভিনীত 'ওথেলো' অনেক বেশি বহুমাত্রিক ও আকর্ষণীয়। উৎপলের 'ওথেলো' এক প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, উদভ্রান্ত, কাফ্রি বীর।

এই সফরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ নাট্য সমালোচক ওসিয়া ট্রিলিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নির্দিষ্ট দিনে সকালে উৎপলের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম। সারা পৃথিবীতেই ট্রিলিং নাটক দেখে বেড়ান। সারা বাড়ি বই ও পত্রপত্রিকায় ঠাসা। লাইব্রেরিতে বসে উৎপলের সঙ্গে নানা বিষয়ে সেই চিত্তাকর্ষক আলোচনায় আমি নিছকই নীরব দর্শক। ভারতের নানা প্রান্তের থিয়েটার নিয়েও মতবিনিময় হল। ট্রিলিং-এর ধারণা ভারতের শিল্পীরা ভাল ইংরেজি বলতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উৎপলের খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে শুদ্ধ ইংরেজি শুনে এই বিদগ্ধ সমালোচকের বদলে গেল মতটা। তিনি খোলামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, উৎপলের নিখুঁত উচ্চারণ ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অতি উচ্চমানের।

এবার একটু পেছনের দিকে ফিরে যাচ্ছি। ১৯৫৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাড়াজাগানো প্রহসননাট্য 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চস্থ হয়েছিল। এল টি জি-র তরফে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে মহম্মদ আলি পার্কে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। আমি মনে করি, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই প্রযোজনা একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এই নাটকে মাত্র ২৭ বছর বয়সে উৎপল বৃদ্ধ, লম্পট গ্রাম্য জোতদার ভক্তপ্ৰসাদের চরিত্রে বৈপরীত্যমূলক অভিনয়ের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তার কোনও সমান্তরাল নজির নেই। এই নাট্য-প্রযোজনা দেখতে এসেছিলেন বাংলা থিয়েটারের দুই দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র। মঞ্চের পাশ থেকে চেয়ারে বসে ভক্তপ্ৰসাদরূপী উৎপলকে দেখে তাঁরা মন্তব্য করেন, এই হল বাংলা থিয়েটারের মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা। এই নাটকে আমি ফতি ও পুঁটি— দুটি চরিত্রেই রূপদান করেছি। আমাদের সৌভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির তরফে চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ এই নাটকটি তাঁর ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলেন। কারণ, এটি ছাড়া উৎপলের আর কোনও বিখ্যাত নাটকের পূর্ণাঙ্গ ভিডিও নেই। কী পোড়াকপাল দেশ!

৪

রমার (সুচিত্রা সেন) চলে যাওয়ার খবর শুনে মন খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অনেক দিন সামনাসামনি দেখা নেই। তবু রমার সঙ্গে কত স্মৃতি, কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করে এল। আমি নিজে সুচিত্রার সঙ্গে বহু ছবিতে কাজ করেছি। আমাকে সুচিত্রা খুব ভালবাসত। আমাদের ঘনিষ্ঠতায় কোনওদিন ছেদ পড়েনি। সুচিত্রা যখন ছবির জগতে সংগ্রাম করছে, তখন থেকে আমি তার সঙ্গী। ও চেষ্টা করে অভিনয় শিখেছে। খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পর বহু ধান্দাবাজ মানুষ ওর চারপাশে ঘুরঘুর করত। তখন বাংলা ছবির অনেক পরিচালক-প্রযোজককে সুচিত্রা জব্দ করে দেয় যারা একসময় ওঁকে অপমান করেছিল। মহানায়িকা হওয়ার পরে সেই সব পরিচালক সুচিত্রার কথায় চিত্রনাট্য পাল্টাত। সুচিত্রা টালিগঞ্জে এসে নায়িকাদের মর্যাদা ও রেট বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওর কাছে বাংলা ছবির সমস্ত অভিনেত্রীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সত্তরের দশকের শুরুতে উৎপল 'ফরিয়াদ' নামে একটি ছবিতে সুচিত্রার বিপরীতে অভিনয় করেছিল। অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্করের কাহিনী নিয়ে এই ছবিতে উৎপল একটি অন্য ধারার ভিলেনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছিল। 'ফরিয়াদ' ছবিতে এক লম্পট, নিষ্ঠুর হোটেল মালিকের ভূমিকায় উৎপলের রূপদান সবাইকে চমকে দেয়। সুচিত্রার সঙ্গে অভিনয় করতে তখন সবাই রীতিমতো ভয় পায়। টালিগঞ্জে সে সময় মহানায়িকার বিপুল দাপট। কিন্তু উৎপলের মতো শিক্ষিত, জাতশিল্পীর সুচিত্রার বিপরীতে অভিনয় করতে কোনও সঙ্কোচ হয়নি। বরং সকলে বুঝে গেল যে, পর্দায় উৎপলের বহুমাত্রিক অভিনয় যে কোনও তারকাকে

ম্লান করে দিতে পারে। আমি নিজে তখন বহুদিন ছবির শুটিংয়ের সেটে বসে উৎপলের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্রের ‘বিজয়া’ অবলম্বনে ‘দত্তা’ ছবিতে উৎপল রাসবিহারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বাংলা থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা শিশির ভাদুড়ির রাসবিহারীর চরিত্রে মঞ্চে অবিস্মরণীয় অভিনয় ভোলার নয়। কিন্তু ‘দত্তা’ ছবিতে সুচিত্রার সঙ্গে রাসবিহারীর ভূমিকায় উৎপল ছিল অনবদ্য। মধ্য সত্তরে সুচিত্রা সেনের অপ্রতিহত গ্ল্যামার ও প্রভাব সত্ত্বেও, এই ছবিতে উৎপলই ছিল যেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

এই ‘দত্তা’ ছবির শুটিংয়ের সেটে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। তখন পুরোদমে ‘দত্তা’-র শুটিং চলছে। একদিন দেখলাম। উৎপল দুপুর বারোটার সময় বাড়ি ফিরে এল। আমি অবাক হেয়ে গেলাম। প্রশ্ন করাতে উৎপল বলেছিল যে, পরিচালক তাঁর কাঁধের পেছন থেকে ক্যামেরায় সুচিত্রার ক্লোজআপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি তুলছে। আর আমাকে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ ধরে এটা চলার পর উৎপল পরিচালককে বলেছিল, ‘আপনি বরং আমার পোশাকটা অন্য কাউকে পরিয়ে বাকি দিনটা ছবি তুলুন। আমি আজ চললাম।’ পরে এই ঘটনার জন্য পরিচালক উৎপলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। সুচিত্রাও বুঝতে পেরেছিল উৎপল কত উঁচুদরের শিল্পী এবং আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন অভিনেতা। সুচিত্রা অবশ্য উৎপলকে দারুণ শ্রদ্ধা করত।

পাঁচ-ছয় বছর আগে একদিন কোনও কাজে মহাকরণে গিয়েছিলাম। একটা ব্যাপারে ওই সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা মন্ত্রীর ঘরে যাই। আমার সঙ্গী ছিল আমাদের ‘এপিক থিয়েটার’ পত্রিকার সম্পাদক। মহিলা মন্ত্রী আমাদের খুবই যত্ন করে বসালেন। তার পর ওই মহিলা নেত্রী আমায় বলেন, ‘শোভাদি, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।’ আমি প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ‘আমায় একবার সুচিত্রা সেনের কাছে নিয়ে যাবেন। আমার ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ওঁকে একবার কাছ থেকে দেখা।’ এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি তাঁকে বললাম যে, আমার সঙ্গে সুচিত্রার একসময় চূড়ান্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা দীর্ঘদিন নিয়মিত পরস্পরকে ফোন করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক কথা বিনিময় হত।

কিন্তু সুচিত্রা লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে। আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। তাই এখন ওকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। আমি চাই, সুচিত্রা ভাল থাকুক।

৫

১৯৫৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার উদ্যোগে পার্ক সার্কাসে ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ উপন্যাসের আংশিক অনুবাদের নাট্যরূপ ‘মে দিবস’ নামে এল টি জি প্রযোজনা করেছিল। নাটকটির অনুবাদ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিল উৎপল এবং আমি ‘মা’-এর ভূমিকায় রূপদান করি। বহুদিন পরে ১৯৮৩ সালে গোর্কির এই যুগোত্তীর্ণ উপন্যাস অবলম্বনে উৎপল ‘মা’ নামে একটি ছায়াছবি নির্মাণ করেছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পটে দার্জিলিং পাহাড়ের জনজীবন নিয়ে এই ছবি তোলা হয়েছিল। এখানেও নামভূমিকায় মা চরিত্রে আমি অভিনয় করেছিলাম।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি মিনার্ভা থিয়েটারে নাটক করা শুরু করলেও উৎপল ব্যক্তিগতভাবে এই হল ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়েছিল। কারণ হলের মালিক কস্তুরচাঁদ জৈন কোনওমতেই দলের নামে লিজ দিতে রাজি হলেন না। উৎপল কয়েক মাস আমার প্রাক্তন স্বামীর আমন্ত্রণে আমাদের বাড়িতে পেইং গেস্ট হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমার স্বামী সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে নিঃস্ব অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন।

উৎপলও ততদিনে টিভলি পার্কের বাসিন্দা। টিভলি পার্কের মালিক মহম্মদ ইসমাইল সাহেব তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হোটেল ছাড়াও ইসমাইল সাহেবের ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। কিন্তু উৎপলের আর্থিক সঙ্কট তখন চরমে। পেশাদার অভিনেতা ও পরিচালক হওয়ার দুঃসাহসিক স্বপ্নে সাউথ পয়েন্টের শিক্ষকতার চাকরিটাও চলে গেছে। তাই মিনার্ভা লিজ নেওয়ার পর উৎপল টিভলি পার্কের ব্যয়বহুল আস্তানা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে উঠে এল থিয়েটার হলের তিনতলার ঘরে। দেশ-বিদেশ থেকে উৎপলের নামে মিনার্ভা থিয়েটারের ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র আসত। সেটাই তখন উৎপলের বাসস্থান ও কর্মভূমি। এই মিনার্ভা থিয়েটারের তথাকথিত 'অভিশপ্ত ভূতুড়ে বাড়ি'-তেই শুরু হয়েছিল তার সৃষ্টির তপস্যা।

'অঙ্গার' নাটকের ঐতিহাসিক সাফল্যের পর এল টি জি উৎপলের লেখা 'ফেরারী ফৌজ' প্রযোজনা করেছিল। বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলন ছিল নাটকের বিষয়বস্তু। নাটক লেখার শুরু থেকেই উৎপলের মেধার সঙ্গে মিশে থাকত সাহস আর সমাজবোধ। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন, 'বিপ্লবী প্রজ্ঞার অক্লান্ত অন্বেষণ ছিল তাঁর চরিত্রে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, উৎপলের নাট্যসত্তার নির্মোহ মূল্যায়ন প্রথম থেকেই কেন অসূয়াদুষ্ট? অগ্নিযুগের প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী বিবেকানন্দ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, গণেশ ঘোষ বা অনন্ত সিংহের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ যখন 'ফেরারী ফৌজ'-কে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখন কেন এই অযাচিত, অমূলক আক্রমণ? কেনই বা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে উৎপলের মননশীল 'পিরিয়ড পিস' রচনা ঐতিহাসিক বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত হল? কোন অজ্ঞাত, গূঢ় কারণে একটি 'প্রখ্যাত' সাপ্তাহিক সাহিত্য/ সংস্কৃতি পত্রিকায় এই নাটকের আলোচনার শিরোনাম ছিল 'একটি আবর্জনার স্তূপ'? অথচ এই নাটকের জন্যই উৎপল শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে ১৯৬৩ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পায়। এ সব ভাবলেই অবাক লাগে। সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে উৎপলের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ষাটের দশকের প্রথমে দিল্লিতে প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর সুপারিশেই রাজধানীর কর্তারা উৎপলকে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার অধ্যক্ষ পদে মনোনীত করেছিলেন। উৎপল নিশ্চিতভাবে এ দেশে এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। এদিকে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঢাকের কাঠি বেজে উঠল। কবীর সাহেব উৎপলকে তাঁর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নাটক করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু উৎপল ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। আমাদের সংসারে তখন আর্থিক টানাটানি প্রবল। তখন আমাদের মেয়ের জন্ম হয়েছে। উৎপল বা আমার কোনও স্থায়ী, নির্দিষ্ট রোজগার নেই। কিন্তু ওরই মধ্যে উৎপল কবীর সাহেবের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিল।

পাশাপাশি কট্টর রাজনৈতিক বক্তব্যে সোচ্চার 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটিকা কবীর সাহেবদের রাজনৈতিক শিবিরের বিরুদ্ধে কার্যত উৎপলের যুদ্ধ ঘোষণা। ফলাফল অবশ্য হাতে হাতেই পাওয়া গেল। ১৯৬২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারবার্তা মারফত দিল্লি থেকে জানানো হল যে, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার অধ্যক্ষ পদে উৎপলের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। উৎপল অবশ্য কোনওভাবেই দমে যায়নি। এখন চারিদিকে দেখি, কিছু অর্থানুকূল্য পদপ্রাপ্তি বা পুরস্কারের জন্য কী নির্লজ্জ, নীতিহীন আত্মসমর্পণ। শাসকের প্রসাদ পাওয়ার জন্য, কী বিবেকহীন প্রতিযোগিতা। তখন উৎপলের আপসহীন সাহস আর অনমনীয় মেরুদণ্ডের কথা ভেবে আজও মন ভরে ওঠে।

উৎপল মিনার্ভা থিয়েটার নেওয়ার পর প্রথমদিকে তার স্বরচিত বাংলায় প্রথম নাটক 'ছায়ানট', 'ওথেলো' বা 'গোর্কি'-র অনুবাদে (উমানাথ ভট্টাচার্যের করা) 'নীচের মহল' খুব ভাল চলেনি। কারণ মিনার্ভা থিয়েটার সংলগ্ন হাতিবাগানের সবজি বিক্রেতারা সন্ধেয় বাজার বন্ধ করে থিয়েটার দেখতে আসে। সেই দর্শকগণ এতে আপ্লুত হয়নি। আমি বাধ্য হয়ে আমার টালিগঞ্জের বাড়ি একটি পাঞ্জাবি পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিলাম। আমি

উঠে যাই পার্ক সার্কাসের সামসুল হুদা রোডে একটি ছোট ফ্ল্যাটে। উৎপলের সঙ্গে তখনও আমার বিয়ে হয়নি।

৬

বিয়ের পর উৎপলের সঙ্গে ইউরোপ ও সোভিয়েত ভ্রমণ থেকে ফেরার পর নতুন নাটক ধরা হল। অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাট্যরূপ দিয়ে উৎপলের পরিচালনায় ১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ দোলপূর্ণিমার দিন মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হল। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই নাটকে 'নবান্ন'খ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎপলের সামরিক শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক মহলা পদ্ধতির মধ্যে ওই অসুস্থ প্রবীণ অভিনেতা ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়েছেন। রাতের পর রাত জেগে ওই সময়ে মহড়া চলত। পরিচালকের কোনও ক্লান্তি নেই। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাদেরও ঘুম নেই। মালোপাড়ার ভাষা, আর উচ্চারণ নীলিমা দাসের মতো অভিনেত্রী, শিখেছিল বিজনদার কাছে। আমরা ততদিনে এস আর দাস রোডে নতুন পাড়ায় উঠে এসেছিলাম। এই ফ্ল্যাটটি উৎপলের খুব পছন্দ ছিল।

ষাটের দশকের এই পর্বে উৎপলের সৃজনশক্তি তুঙ্গ স্তরে উঠেছিল। সারা রাত এই সময়ে চলত থিয়েটারের মহড়া। আমরা দিনের বেলা ঘুমিয়ে বা বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করতাম। কিন্তু উৎপল গোটা দিন মগ্ন থাকত নাট্য ও প্রবন্ধ রচনা বা অন্য সারস্বতচর্চায়। পাশাপাশি এরই মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর মতো পথনাটক বা বক্তৃতা দিয়ে প্রচার সমাবেশের মধ্যমণি ছিল উৎপল। সন্ধ্যায় হোত নাটকের শো। উৎপলের এই নিরলস পরিশ্রম এবং দানবীয় কর্মকাণ্ডের রহস্য কী?

এই সময়ে শরীরের স্বাভাবিক ক্লান্তি, অবসাদ এবং নিদ্রার অমোঘ প্রভাব কাটাতে উৎপল নিয়মিত স্নায়ু উত্তেজক, অত্যন্ত ক্ষতিকারক 'কোরিড্রেন' ওষুধ খেয়ে গেছে। আমি জানার পর এই আত্মবিনাশকারী ওষুধ খাওয়া বন্ধের চেষ্টা করেছি। হাতের কাছ থেকে ওষুধ সরিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে দিনের পর দিন ওই ওষুধ খেয়ে উৎপল তার সৃজনক্ষমতা চাঙ্গা রেখেছে। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে চিন্তাশক্তি ও লেখনীকে দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সপ্রতিভ রাখতে গিয়ে উৎপলের শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এই মারণ স্টেরয়েড ওষুধগুলি উৎপলের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিরস্থায়ী ক্ষতি করে দিয়েছিল - যা তার অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উৎপলের জীবনের একটি সেরা পরিচালনার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিজন ভট্টাচার্যের মতো খ্যাতিমান, শক্তিশালী অভিনেতাও পরিচালক উৎপলের দাপটে পার্ট মুখস্থ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসলে বিজনদা ছিলেন আবেগাশ্রয়ী অভিনেতা, তাই চরিত্রে ডুবে গিয়ে পার্ট ভুলে যেতেন। কিন্তু উৎপলের মতে, অভিনেতার এত আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়, বৈজ্ঞানিক থিয়েটারে এটা চলে না। যাই হোক, 'তিতাস' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরির সুরে ও গানে, তাপস সেনের আলোর মায়ায়, মালোপাড়ার মাটির গন্ধমাখা জীবন-চিত্রণে, কৌম সংস্কৃতির পরিচয়ে এই নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

'তিতাস'-এর অন্য আকর্ষণ 'কালোবরণ' চরিত্রে উৎপলের দোর্দণ্ড- প্রতাপ অভিনয়। আমার অনুতাপ, আজকের থিয়েটারের ছাত্রছাত্রী বা দর্শক এগুলি দেখতে পেল না। কারণ, 'ফরিয়াদ' ছবির লম্পট, নির্মম হোটেলমালিক কিংবা 'অমানুষের' মহিম ঘোষাল অথবা 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবির মগনলালের থেকে কালোবরণ একেবারে আলাদা। কলকাতা পুরসভা 'তিতাস' নাটকে হলের মাঝখানে ক্যাট ওয়াকের জন্য র‍্যাম্প ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এর মধ্যে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'তিতাস' দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। উৎপলের প্রতিটি নাটক তিনি দারুণ আগ্রহভরে প্রথমেই দেখতেন। উৎপল নাট্যাঙ্গিক শিখেছিল মস্কোয় রুশ নাট্যনক্ষত্র অখলপকভের কাছে। শেষে সত্যজিৎবাবুর নির্দেশে

কলকাতা পুরসভা এই নাটকের ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

ষাটের দশকের দিনগুলি ছিল অস্থির, উত্তেজনাময়। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে এই দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শাসকশ্রেণী ও প্রভাবশালী গণমাধ্যমের ক্রমাগত ইন্ধনে ১৯৬৪ সালে কলকাতার রাস্তায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্ঘর্ষের লেলিহান আগুনে মধ্য কলকাতার কলাবাগান বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কাছেই বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটারে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হামলা চালাল। কারণ, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এর প্রতিবাদে উৎপল বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ফ্রিডরিশ ভোলফের 'প্রোফেসার মামলক' মূল জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছিল। শাসকশ্রেণী কীভাবে জাতিদাঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, এই নাটকে তা দেখানো হয়েছিল। এই নাটকেই সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেত্রী রিনা (অপর্ণা সেন) এল টি জি-তে যোগ দিয়েছিল। রিনা ছিল আমার বহুদিনের পরিচিত। সে আমায় শোভামাসি বলে ডাকত। কিন্তু উৎপলকে রিনা রীতিমতো ভয় পেত সে সময়ে। বিশেষত থিয়েটারের প্রশিক্ষণ শিবিরে। রিনার সমস্ত সমস্যা, নালিশ আমায় জানাত। মহলার সময় আমিও অবশ্য উৎপলকে ভয় পেতাম। এই নাটকে প্রফেসার মামলকের চরিত্রে উৎপলের অবিস্মরণীয় অভিনয় আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল।

১৯৬৫ সাল আমার জীবনের এক উত্থাল-পাথাল পর্ব। আমার জীবন মানে তো উৎপলকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত। সে বছর মার্চে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল উৎপল রচিত ও পরচালিত 'কল্লোল' নাটক। ১৯৪৬ সালের ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ জাহাজ 'খাইবার'এর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে উৎপলের এই নাটক অবশ্যই আমাদের থিয়েটারের ইতিহাসে একটি ক্রোশফলক।

৭

'কল্লোল'-এর আলোর দায়িত্বে ছিল আলোর জাদুকর তাপস সেন। উৎপলের পরিকল্পনা মতো তাপস তখন সুরেশ দত্তকে ধরে আনল। সুরেশ তার আগেই মস্কো থেকে পাপেট থিয়েটারের তালিম নিয়েছিল। এল টি সি-র শিল্প নির্দেশক নির্মল গুহরায় প্যারিস থেকে ফিরেছিল নাট্যকৌশল শিখে। মঞ্চে 'খাইবার' যুদ্ধজাহাজের মডেল। উৎপলের অনবদ্য সৃষ্টি 'কল্লোল' নাট্যকের বলিষ্ঠ বক্তব্য, মৌলিক মঞ্চস্থাপত্য, অভিনব আলোর খেলা, সময়োচিত পোশাকসজ্জা, আবহসঙ্গীতে জার্মান, রুশ ও চীনা নৌবিদ্রোহের গান সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল।

'কল্লোল' নাটক নিয়ে আমি কোনও তাত্ত্বিক আলোচনায় যাচ্ছি না। আমি সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। নাট্যসমালোচক ও পণ্ডিতরা সেসব নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন। বাংলা থিয়েটারের ছাত্রছাত্রীগণ সেসব নিয়ে গবেষণা করবেন। আমি শুধু এক বিশাল কর্মযজ্ঞের বিশ্বকর্মা উৎপলের নাটকীয় জীবনের উত্থান ও টানাপোড়েনের ধারাভাষ্য দিচ্ছি মাত্র। কিন্তু খাইবার রণতরী শুধু ১৯৪৬ সালের ইতিহাসকে নয়, ১৯৬৫ সালেও বিডন স্ট্রিটের মিনার্ভায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই অভ্যুত্থানের প্লাবন কলকাতা ছাড়িয়ে দিল্লিতেও ধাক্কা মারল। এই নাটক যেন ভীমরুলের চাকে আঘাত করেছিল। 'কল্লোল' যখন মঞ্চস্থ হয়, উৎপলের বয়স তখন মাত্র ৩৬ বছর। লালবাজারের একজন পুলিস অফিসার গোপনে তাঁদের সংগ্রহশালা থেকে শাহদাত আলির লেখা 'নৌবিদ্রোহ' এই নিষিদ্ধ পুস্তিকাটি উৎপলকে এনে দিয়েছিলেন।

'কল্লোল' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক শুরু হল। The Statesman কাগজ পরিহাস করে লিখেছিল। 'The Mutiny of Beadon Street'। এই পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক উৎপল অবশ্য পাল্টা জবাব লিখেছিল, 'স্টেটসম্যান ভুল ইংরেজির হেডলাইন দিয়ে নৌবিদ্রোহ নয়, বিডন স্ট্রিটের বিদ্রোহকে উদ্ঘাটিত

করতে চাইল।' কিন্তু সব বড় কাগজই 'কল্লোল'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। বামপন্থী 'পরিচয়' পত্রিকাতেও নাটকে প্রদর্শিত ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। উৎপল অবশ্য এর উত্তরে লিখেছিল, ঠিক যে কারণে আইজেনস্টাইনের 'পোটেমকিন' জাহাজ সিনেমায় আত্মসমর্পণ করে না, বাস্তবে করা সত্ত্বেও, সেই কারণে 'খাইবার'ও করে না।

সে সময় একমাত্র 'The Statesman' বাদে রাজ্যের সব বড় কাগজেই 'কল্লোল'-এর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ছিল। গণমাধ্যমের এই অসহযোগিতা এবং অগণতান্ত্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, মধু বসু, মন্মথ রায়রা। এদিকে তাপস সেনের নেতৃত্বে এবং তাঁর সৃষ্ট 'কল্লোল, চলছে চলবে'-এর পোস্টারের ব্যাপকতায় মহানগরী উদ্বেল হয়ে ওঠে। বড় কাগজে কোনওরকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই মানুষের মুখে মুখে 'কল্লোল'-এর স্রষ্টা উৎপল সম্পর্কে গণউন্মাদনা বেড়ে চলে। যা রাজ্য রাজনীতিতে অভূতপূর্ব জোয়ার এনেছিল। এদিকে, মধ্য ষাটে বাংলার গ্রামসমাজে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছিল। একদিকে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে মানুষের অনাহারে মৃত্যুর মিছিল, অন্যদিকে রাজনৈতিক মদতে গ্রামে মজুতদার-রাজ চলছিল। এই পটভূমিতে ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে উৎপল লিখল 'সমাজতান্ত্রিক চাল' ফার্স্ট শো-র পরই সরকারের নির্দেশে এই বারুদে ঠাসা পথনাটিকা নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। নাট্যকার-পরিচালক উৎপল এবং প্রকাশক জোছন দস্তিদারের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন শারদীয় 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় উৎপলের 'সংগ্রামের আরেক দিক' শীর্ষক একটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই এই নিবন্ধটিও দেশবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী তকমা দিয়ে পত্রিকার এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মনে আছে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরদিন, ২৩ সেপ্টেম্বর পুজোর ঠিক আগে উৎপলকে পুলিস বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। উৎপলকে 'ভারত রক্ষা আইনে' বন্দী করা হয়েছিল। আমার জীবনে এই অভিজ্ঞতা প্রথম হল। তখন আমার উদভ্রান্তের মতো অবস্থা। কিন্তু পরে মন শক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি নিলাম। উৎপলের গ্রেপ্তারের পর আমাদের থিয়েটারের দলের মধ্যেও কিছু আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমি প্রাণপণে কলাকুশলীদের উৎসাহ দিতাম। আমাদের নাটক বন্ধ হয়নি। 'কল্লোল'-এর প্রতিটি শো এই সময় হাউসফুল হয়েছে। উৎপলকে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী করে রেখেছিল। সপ্তাহে একদিন জেলে দেখা করতে যেতাম। লক্ষ্য করতাম, উৎপলের স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বুঝতাম, জেলের অকথ্য খাবার তার মুখে ওঠে না। বাড়ি থেকে যতটা পারতাম খাবার নিয়ে যেতাম, তখন উৎপলের ঘরে বন্দীদের ভোজ লেগে যেত। মনে মনে উৎপলের প্রতিভা আর সাহসের জন্য গর্ব অনুভব করতাম।

উৎপলের গ্রেপ্তারের পর বুঝলাম তাঁর আন্তর্জাতিক, খ্যাতির ব্যাপ্তি। ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত টাইমস, গার্ডিয়ান, অবজার্ভার পত্রিকা, মার্কিন আন্ডার গ্রাউন্ড থিয়েটারের জোসেফ সলবি, জার্মান নাট্যকার ডঃ ফন কুবা ও পরিচালক হান্স পের্টেন, সোভিয়েত কবি দোলমাতোভস্কি ও প্রাগে দুসান জবাভিভেল, লন্ডনে ওয়াল্টার নান এবং ভারতে বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায়, মধু বসু ও মন্মথ রায়ের নেতৃত্বে অসংখ্য শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, উৎপলের মুক্তির দাবিতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ কলকাতায় উৎপলের মুক্তির দাবিতে শিল্পীকলাকুশলী তথা সাধারণ মানুষের বিশাল প্রতিবাদী মিছিলে হাঁটলেন সত্যজিৎ রায়। এরই ফলে পরের মাসে উৎপল জেল থেকে মুক্তি পেল। সঙ্গে জোছন দস্তিদারও।

১৯৬৬ সালে উৎপলের কারামুক্তির পর ৭ মে ময়দানে হয়েছিল 'কল্লোল বিজয় উৎসব'। এই সমাবেশে পাঁচ লাখ মানুষের জমায়েতে খাইবার ডেকের মতো সাজানো মঞ্চে উৎপলকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। এই সময়ে পূর্ব জার্মানি থেকে আমাদের সরকারি আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক কারণে ভারত সরকার উৎপলকে দেশছাড়ার অনুমতি দিল না। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আমি চার বছরের মেয়েকে নিয়ে দেশ ছেড়ে

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পাড়ি দিয়েছিলাম। উৎপল সঙ্গে না থাকায় গোটা সফরটা সেবার কোনও মাত্রা পেল না যেন। ওর মতো সহৃদয় শিক্ষক যে জীবনে দেখিনি।

৮

এদিকে 'তীর' নাটকের মহলা ও প্রস্তুতি চলতে থাকে। চীন থেকে এই সময়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল। আমাদের সরকারও সে সময় নকশালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। 'তীর' নাটকে পুলিসের হাতে বিদ্রোহী আদিবাসী কৃষক রমণীদের নির্মম হত্যার একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল। এই দৃশ্য অভিনীত হওয়ার সময় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকগণ উদ্বেলিত হয়ে উঠত। 'তীর' নাটকের মহলা চলাকালীনই ১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর। উৎপলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। এই সময়ে উৎপল আত্মগোপন করেছিলেন এবং ছদ্মবেশে সাদা পোশাকের পুলিসের সামনে দিয়ে মিনার্ভায় ঢুকে মহলা পরিচালনা করতেন। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিনার্ভায় 'তীর' নাটক মঞ্চস্থ হল এবং কয়েক দিনের মধ্যে ২৪ ডিসেম্বর বোম্বাইতে উৎপল দ্বিতীয়বারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন। এবার একটি অতিবিপ্লবী মতবাদের প্রচারক রূপে। 'তীর' নাটকের জন্য পুলিস উৎপলকে বোম্বাইয়ের তাজ হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। এরপর সারা দিনরাত শহরের গোয়েন্দা পুলিসের সদর দপ্তরে চলে বিরামহীন টানা জেরা। সেবার বড়দিনটা উৎপল ভালই কাটালেন বোম্বাই পুলিসের অতিথি হয়ে। তারপর আরবসাগরের তীর থেকে বিমানযোগে সরাসরি কলকাতা। এবার উৎপলের অস্থায়ী ঠিকানা হল দমদম সেন্ট্রাল জেল। এই ঘটনায় আমার পাগলের মতো অবস্থা।

আগেরবার 'কল্লোল' নাটকের পর দীর্ঘ ৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী অবস্থায় কেটেছে উৎপলের। জেলের খাবার না খেতে পেরে উৎপলের শরীর স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি হয়। প্রচুর ওজনও কমে গিয়েছিল। কিন্তু সৃজনশীলতা নষ্ট হয়নি। তাই জেলের মধ্যে বসে দুটি নাটক (যেমন 'কঙ্গোর কারাগারে' ও 'লৌহমানব') লিখে রাজবন্দীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। পুরো 'শেক্সপিয়রের সমাজচেতনা' গ্রন্থ রচনার টীকাসমৃদ্ধ জেলখানার ডায়েরিগুলি এই কারাজীবনের ফসল। ইংরেজিতে চারটি অসামান্য কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি আমায় নিয়ে লেখা অনবদ্য 'মাই ওয়াইফ'। যা পরে একটি সঙ্কলনে ছাপাও হয়েছিল। আমায় নিয়ে উৎপল 'শোভাকে' কবিতায় লিখেছিলেন—

> 'তাই অনাগত কুয়াশায় ঢাকা এক ভোরে
> আমি চোখ মেলে দিয়ে দেখি
> ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি
> লড়ে যাচ্ছি দুই কমরেড।

উৎপলের পাশে থেকে সেই লড়াই করে গেছি সারাজীবন। কিন্তু ২৬ ডিসেম্বর দমদম সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে দেখলাম উৎপল মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিচলিত ও বিধ্বস্ত। কারণ ইতিমধ্যে উৎপলের সঙ্গে বিশ্বখ্যাত মার্চেন্ট আইভরি চলচ্চিত্র সংস্থার প্রযোজিত 'দ্য গুরু' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তি হয়েছিল। এই ছবিতে উৎপল একজন ভারতীয় সঙ্গীতগুরুর চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। 'দ্য গুরু' ছবির সঙ্গীত

পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত সেতারশিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খান। তাঁর ভাই ইমরাত খানের কাছে উৎপল ইতিমধ্যে সেতারবাদনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। 'দ্য গুরু' ছবিতে উৎপল ছাড়া অনেক খ্যাতনামা বিদেশি অভিনেতা/অভিনেত্রী অংশ নিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর কলাকুশলীগণ শুটিংয়ের জন্য ভারতে এসে উপস্থিত। এক বিরাট আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি। বিদেশি প্রযোজক কোম্পানি ছবি তোলার জন্য প্রচুর অর্থলগ্নি করে ফেলেছে। সেই সময় ছবির প্রধান অভিনেতা গ্রেপ্তার। এই দুর্বিপাক উৎপলকে তীব্র সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিল।

তারপরের ঘটনা সর্বজনবিদিত এবং চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও জীবন্ত। এখনও উৎপলের 'দ্য গুরু' ছবিতে অভিনয়, গ্রেপ্তার, কারাবরণ ও মুক্তিলাভ নিয়ে উত্তপ্ত বাদানুবাদের আলোড়ন প্রবহমান। উৎপলকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখার পর ইসমাইল মার্চেন্ট কলকাতায় এসে রাজনীতির ওপর মহলে অনেক তদ্বির করে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায়। ইসমাইল মার্চেন্টের অনুরোধে বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন উৎপলকে মুক্তি দিতে। সত্যজিৎবাবুর বক্তব্য ছিল, উৎপল একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতা এবং একটি বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র উদ্যোগের প্রধান রূপকার। শিল্পীরূপে উৎপলের এই অভাবনীয় স্বীকৃতিকে মর্যাদা দেওয়া উচিত।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'দ্য গুরু' ছবির শুটিং চলাকালীন উৎপল কলকাতায় আসতে পারবেন না এবং সরাসরি কোনও রাজনীতির কাজে যুক্ত হবেন না— এই শর্তের বিনিময়ে তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু এই 'বহুচর্চিত', 'বহুনিন্দিত', 'বহুপল্লবিত মুচলেকা-কাণ্ড' নিয়ে উৎপল অনেক ব্যক্তিকুৎসা এবং রাজনৈতিক চরিত্রহননের শিকার হয়েছিলেন। সরকারি প্রচারমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের অপপ্রচার শুরু হল। একশ্রেণীর ছাপাখানার মালিক এই সুযোগে উৎপলের খ্যাতির গৌরবকে কালিমালিপ্ত করতে চাইল। এখনও দেখছি, এই 'মুচলেকা বৃত্তান্ত' নিয়ে অনেক ভুল তথ্যে ভরা, বালখিল্য রচনার বদহজমের ওগরানি। নিতান্ত অজ্ঞতা ও অসূয়াপ্রসূত সেই সব মতামত যাতে শুধু হীনমন্যতাবোধ ও বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।

এতরকম তিক্ততা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও 'দ্য গুরু' ছবির শুটিং আমার মনে এখনও এক মনোরম উজ্জ্বল স্মৃতি। সেই শুটিং হয়েছিল রাজস্থানের বিকানিরের একটি রাজপ্রাসাদে। উৎপল মুক্তি পাওয়ার পর ঘরেবাইরে নানা অপমান ও আঘাতের মধ্যে আমি ছ'বছরের ছোট মেয়ে পিউকে নিয়ে দিল্লি হয়ে বিকানিরে চলে যাই। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বিকানিরের প্রধান রাজপ্রাসাদে। সেই অপূর্ব মরুশহরের কেন্দ্রে গাছপালাঘেরা বিশাল বাগানের মধ্যে রাজস্থানি স্থাপত্যের রাজকীয় নিদর্শন লালগড় রাজপ্রাসাদ। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যে বাগানে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ছোট্ট মেয়ে পিউ বাগানে গাছপালার মধ্যে ময়ূরের নাচ দেখে উল্লসিত। গাছে গাছে নতুন পাতা ও ফুলের সম্ভার। তখন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। যাই হোক, বিকানির থেকে ট্রেনে দিল্লি গেলাম। চলন্ত রেলগাড়িতে শুটিং হয়েছিল। তারপর দিল্লি থেকে চার্টার্ড প্লেনে বেনারস। ছবির বিখ্যাত সব শিল্পীর মধ্যেও উৎপল ছিলেন মধ্যমণি। বেনারসে কয়েকদিন টানা শুটিং হয়েছিল। সেখানে দোলের দিন এই ছবির বিশ্ববিখ্যাত নায়িকা রিটা টাশিংহামের জন্মদিনে খুব আনন্দ হয়েছিল। শুটিংয়ের ইউনিটের সবাই মিলে জোর করে উৎপলকে রঙ দিয়ে রঙিন করে দিয়েছিল।

৯

আমি যখন লন্ডনে, তখন চিঠি পাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার উৎপলকে শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক রূপে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উৎপল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে এবং 'দেশব্রতী' পত্রিকায় এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছে, যার নাম 'শাহেনশা তোমার পুরস্কার তোমারই থাক'। সেই আগুনঝরা দিনে এই কবিতা প্রতিবাদী ছাত্র-যুবদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি কলকাতার একটি নামী প্রকাশনা সংস্থা এই শিরোনামে উৎপলের একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করেছে। প্রত্যাখানের কারণস্বরূপ উৎপল জানিয়েছিল, 'যে হাতে কারাদণ্ড, সে হাতেই পুরস্কারের প্রলোভন শোভা পায় না।' শাসকের ভিক্ষাদানের প্রতি এই ঘৃণাভরা তাচ্ছিল্য যেন আমার উৎপলকেই মানায়।

সে বছরই ৩১ আগস্ট উৎপল ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লিখেছিল, 'অজেয় ভিয়েনাম'। তখন 'ভিয়েৎনাম কুরিয়ার' নামক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত 'মিলাই'-এর চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড এবং পৈশাচিক নরমেধযজ্ঞের পটভূমিতে রচিত ছিল এ নাটক। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটক দেখে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার সাংবাদিক ক্লার্ক সাহেব সাজঘরে এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিলেন। উৎপলের কাছে ক্রোধান্বিত ক্লার্কের

প্রশ্ন ছিল, 'মার্কিন সেনারা নিরস্ত্র, নিরপরাধ ভিয়েৎনামি গ্রামবাসীদের খুন করেছে এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন? তৎক্ষণাৎ উৎপলের সোজাসাপ্টা উত্তর – 'হ্যানয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকায়।' তখন মার্কিন সাংবাদিক আরও খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন, 'ওটা ভিয়েতনামিদের অপপ্রচার।' অবিচলিত উৎপলের জবাব ছিল, 'ভিয়েৎনামিদের কথা আমার কাছে বেদবাক্য আর মার্কিনরা হল দুনিয়ার পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী।' দেশে ফিরে মার্কিন সাংবাদিক ক্লার্ক নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাতায় উৎপলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্বেষের বিষ উগরে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটাই সময়ের পরিহাস। পরে খোদ মার্কিন মুলুকেই 'মিলাই'-এর নারকীয় গণহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উৎপল এই নাটকটি নিজে ইংরেজিতে 'Invincible Vietnam' নামে ভাষান্তর করেছিল। ১৯৬৭ সালে 'অজেয় ভিয়েৎনাম' জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে পূর্ব জার্মানির স্টক শহরের কোলক্স থিয়েটারে প্রযোজিত হয়েছিল। সে সব ইতিহাস।

১৯৬৭ সালের ১ মে অনেক ঝড়ঝাপ্টা পেরিয়ে নিজেদের বাড়ি 'কল্লোলে' ফিরে এলাম। আগেই বলেছি, নিতান্ত আর্থিক প্রয়োজনে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলাম একটি পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীকে। উৎপলের সঙ্গে বিয়ের পরে সংসার পেতেছিলাম প্রথমে পার্ক সার্কাসের সামসুল হুদা রোডে এবং পরে এস আর দাস রোডের ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু এই পাঞ্জাবি পরিবার বাড়ি ছাড়ছিল না। দীর্ঘদিন ভাড়াটের বিরুদ্ধে মামলা চলেছিল, রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া জমা পড়ায় আর্থিক সুরাহা হয়নি। এদিকে উৎপলের অসংখ্য বই রাখার জন্য বড় লাইব্রেরি ঘর দরকার। যাই হোক, অনেক দিন নাস্তানাবুদ হয়ে শেষে নিজের বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে বাসস্থান ফিরে পেলাম।

সেই থেকে 'কল্লোল' বাড়িতেই আমৃত্যু উৎপল বর্ণময় ঝোড়ো জীবন কাটিয়ে গিয়েছে। আমি যেন এই ৯০ বছর বয়সে উৎপলের স্মৃতি বিজড়িত, ঘটনাবহুল এক যক্ষপুরী আগলে বসে আছি। পঞ্চাশের দশকে প্রায় জলের দরে টালিগঞ্জের আজাদগড়ে দশ কাঠা জমি কিনেছিলাম। এর পর ধীরে ধীরে প্রথমে একতলা এবং পরে উৎপলের অর্থানুকূল্যেই দোতলা হয় সাধের 'কল্লোল'। তিনতলার ছাদ সংলগ্ন উৎপলের প্রিয় গ্রন্থাগারে আজও শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ভাষার কয়েক হাজার মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই। উৎপলের জীবনের এই প্রিয় সঙ্গীকে বুক দিয়ে আগলে চলেছি। কোনও রকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই। এই বাড়িতে বসেই উৎপল তার প্রথম যাত্রা-নাটক 'রাইফেল' কিংবা বাংলা থিয়েটারের মহত্তম সৃষ্টি 'টিনের তলোয়ার'-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরচনা করেছে। এই বাড়ির উত্তর দিকে গ্রিল দেওয়া খোলা অলিন্দে দিনের পর দিন চলত তার একান্ত সারস্বতচর্চা।

১৯৬৭ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে উৎপল পথনাটিকা লিখেছিল 'দিন বদলের পালা'। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই পথনাটক আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। পুরো তিন ঘণ্টার এই পথনাটিকা নিয়ে উৎপল পুরোদমে ভোটযুদ্ধের ময়দানে নেমে দিনে ২/৩টে পর্যন্ত শো করেছিল। পথনাটক ছিল উৎপলের রাজনৈতিক শিক্ষার হাতিয়ার। তবে পথনাটকে উৎপল কখনও গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিত না। ব্যঙ্গ-তামাশায়-শাণিত- বিদ্রুপে হাস্যরসের মাধ্যমে এই পথনাটক মানুষকে প্রাণিত করত। 'দিন বদলের পালা' একটি দৃষ্টান্ত।

কিন্তু রাজনীতির আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ আবার ঘনিয়ে এল। ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে একটি সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনা সারা দেশে দাবানল সৃষ্টি করেছিল। একটি স্থানীয় জোতদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিসের গুলিচালনা রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন নিয়ে এল।

সেই অগ্নিস্রোতে ভেসে উৎপলও উত্তরবঙ্গে হাজির হয়েছিল। থিয়েটারের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাপস সেন ও নির্মল গুহরায়কে নিয়ে উৎপল শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, আলিপুরদুয়ার - বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। এই ঘটনায় আমাদের দেশের বাম আন্দোলন বিভাজিত হয়েছিল। উৎপল ও তার সঙ্গীরা কৃষক

অভ্যুত্থানের প্রথম সারির নেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং গুলি চালাবার দিনে স্থানীয় কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও গান রেকর্ড করে কলকাতায় ফিরে এল।

একটা কথা এখানে বলা খুব দরকার। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময়ই গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে উৎপলের চূড়ান্ত মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। সেই সময় উৎপলের নেতৃত্বে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গড়ে ওঠে এবং এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মুখপত্র রূপে 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকা জন্ম নিয়েছিল। উৎপল ছিল 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকার সম্পাদক। এই সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তারা ছিলেন জোছন দস্তিদার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, বিদ্যুৎ বসুরা। ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পর মিনার্ভা থিয়েটার 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'-র প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

উত্তরবঙ্গ থেকে ঘুরে এসেই উৎপল লিখেছিল তার বহু বিতর্কিত 'তীর' নাটক। কালক্রমে যা নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। উৎপলের মতো প্রবাদপ্রতিম প্রতিভা এই সময়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক নেতায় পরিণত হয়। নকশালপন্থী দলের রাজনৈতিক সমাবেশ, পথসভা, পার্টি ক্লাস - সবখানেই অসাধারণ বাগ্মী উৎপল ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মিনার্ভা থিয়েটার এই সময়ে কার্যত বাম ছাত্রযুব এবং পার্টিকর্মীদের কমিউনে রূপান্তরিত হয়েছিল। খুব মনে পড়ে মিনার্ভার পথ নির্দেশ করে কলকাতার রাস্তায় তখন পোস্টার পড়েছিল 'তীরচিহ্নিত পথে এগিয়ে চলুন'।

১০

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে উৎপল যখন মধু বসুর 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করে তখন তার বয়স মাত্র ২১ বছর। কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলে কিংবা টালিগঞ্জ পাড়ায় সে সময় একটা চালু ধারণা ছিল যে, এই যুবক মাইকেলের বংশধর। মধুসূদন নিশ্চয় উৎপলের অন্যতম আদর্শ চরিত্র। জীবনের মধ্যবয়সে এসে উৎপলের 'দাঁড়াও পথিকবর' নাটক একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মাইকেলের সঙ্গে প্রতিভায়, মেধায়, ঋজু চরিত্রে, চেহারার দীপ্তিতে উৎপলের মিল লক্ষণীয়।

এখনও মনে আছে, এক গ্রীষ্মকালে কালিম্পঙের কাছে লুলেগাঁও পাহাড়ের বনবাংলোতে বসে উৎপল লিখেছিল 'দাঁড়াও পথিকবর' নাটকটি। চারপাশে বন্য, অনির্বচনীয় প্রকৃতি, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা, ভোরের সূর্যোদয়, দিনে মেঘ ও বৃষ্টির লুকোচুরির মাঝে আকাশভরা রামধনুর মায়াবী আলো— তার মধ্যে নিয়মিত সাত-আট ঘণ্টা করে চলছে উৎপলের সৃষ্টিতপস্যা। সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোয় উৎপল সেই নাটকের অংশ পড়ে শোনায়। লুলেগাঁও বন বিভাগের অতিথিনিবাসে যেন উনিশ শতকের স্বর্ণপ্রসূ সময় জেগে ওঠে। মনে হয় আমরা সভ্যতা থেকে বহুদূরে নির্বাসিত। কিন্তু তারই মধ্যে এক অবক্ষয়ী সমাজের বিরুদ্ধে সেই উদ্দাম, বিদ্রোহী প্রতিভা মাইকেলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা চলছে উৎপলের কলমে। অনেকদিন পরে বাংলা মঞ্চে মধুসূদনের ভূমিকায় উৎপলের বর্ণময় অভিনয় সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকের বাংলা ছবিতে উৎপলের অভিনয়ের একটা বিশেষ টাইপ ছিল। তখন পরিচালকরা সম্ভ্রান্ত সমাজের চোস্ত ইংরেজি-জানা ব্যারিস্টার বা গুরুগম্ভীর ডাক্তারের চরিত্রে উৎপলকে নির্বাচন করতেন। ষাটের দশকের শুরুতেই মুক্তি পেল উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনের অমর রোমান্টিক জুটির ছবি 'সপ্তপদী'। সেখানে শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' নাটকের একটি নির্বাচিত অংশে সপ্তপদী উত্তমের অভিনয়ের নেপথ্যকণ্ঠে উৎপলের সেই অননুকরণীয় সংলাপের জাদু সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। উৎপলের শেক্সপিয়রের নাটকের দুর্দান্ত অভিনয় ও পরিচালনার খ্যাতি বিদগ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু 'সপ্তপদী'র ওথেলো চরিত্রে উৎপলের এই অনন্য নেপথ্য-অভিনয় আপামর দর্শককে ভাসিয়ে দিয়েছিল। উৎপল যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই জেফি কেড়ালের কাছে শেক্সপিয়রের থিয়েটারের তালিম নিয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সাহেবি কাগজে বড় বড় সমালোচনা বের হত। 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজের লিন্ডসে এমার্সন সাহেব তো উৎপলের

অভিনয়ের রীতিমতো অনুরাগী হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই পার্ক স্ট্রিটের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উৎপলের ইংরেজিতে শেক্সপিয়রের নাট্য প্রযোজনা দেখতে আসতেন বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। পরে উৎপল বাংলাতেও শেক্সপিয়রের মহান কালজয়ী নাটক করেছিল। এখন বাংলা মঞ্চ পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য ভুলে গেছে।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ দরকার। বাংলা চলচ্চিত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে আমি বহু ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। বেশিরভাগ ছবিতেই উত্তমের মায়ের ভূমিকায়। অভিনয়ের ব্যাপারে উত্তমের একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের কোনও তুলনা হয় না। এই সাধনাই উত্তমকে সাফল্য ও খ্যাতির তুঙ্গে নিয়ে যায়। বাংলা ছবিতে উত্তমের প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। 'সপ্তপদী' ছবিতে ওথেলোর চরিত্রে নিখুঁত রূপদানের জন্য উত্তমের কী প্রচণ্ড চেষ্টা দেখেছি। উৎপলের কাছে এসে ওথেলো চরিত্রটির ওই নির্বাচিত অংশ টেপ করে উত্তম নিয়মিত অনুশীলন করেছিল। এমনকি, ইংরেজিতে ওথেলো চরিত্রের ওই শেক্সপিয়র সৃষ্ট সংলাপ ও উচ্চারণ উত্তম সঠিকভাবে রপ্ত করেছিল। উৎপলের কাছে শেক্সপিয়রের থিয়েটারের অভিনয়রীতি শিক্ষায় উত্তমের কোনও অহংবোধ দেখিনি। কারণ উত্তম ছিল পেশাদার অভিনেতা। উৎপলের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, 'সপ্তপদী' ছবিতে ওথেলোর ওই আলোড়নকারী নাট্যাংশের অভিনয়ে উত্তম দারুণভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। তাই উত্তম নিজেই ওই অভিনয়টুকু স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে করতে পারত। উৎপল এই কথা পরিষ্কারভাবে পরিচালককে জানিয়েছিল। কিন্তু ছবির পরিচালক কোনও মতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। কারণ ইতিমধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, শেক্সপিয়রের নাটকের খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণ ও অভিনয়ে সারা ভারতে উৎপল দত্তের কোনও বিকল্প নেই।

এরপর উত্তমকুমারের সঙ্গে উৎপল বহু বাংলা ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিল। দুজনের মধ্যে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধাই ছিল। উৎপল বরাবরই বলত, ছায়াছবিতে উত্তমের পর্দাব্যক্তিত্বের তুলনা মেলা ভার— চেহারাও নায়কোচিত। সেই জন্যই বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায় তাঁর 'নায়ক' ছবিতে নামভূমিকায় উত্তমকেই মনোনীত করেছিলেন। একটা সময়ে, মূলধারার বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে উত্তমের বিপরীতে উৎপল ছিল জনপ্রিয় প্রথাসিদ্ধ খলনায়ক।

একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মুম্বইয়ের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক, শক্তি সামন্ত 'অমানুষ' নামে একটি বাণিজ্য সফল ছবি করেছিলেন। 'অমানুষ' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার এবং একজন চক্রান্তকারী খলচরিত্র মহিম ঘোষালের ভূমিকায় উৎপল দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিল। সেই ছবিতে উৎপল মহিম ঘোষালের চরিত্রে রূপদানের সময় একটি পা খুঁড়িয়ে বা লেংচে হাঁটার মুদ্রাদোষ ব্যবহার করেছিল। মহিম ঘোষালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য - এই টিপিক্যাল মুদ্রাদোষটি ভীষণ খাপ খেয়ে যায়। পরিচালক শক্তি সামন্তও এই আকর্ষণীয় অভিনয়ভঙ্গিতে দারুণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু উত্তমকুমার এতে আপত্তি তোলেন। তবে পরিচালক শক্তি সামন্ত ছিলেন এই ব্যাপারে অনড়। শুটিং কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পরে উত্তম বুঝতে পারেন যে শক্তি সামন্ত টালিগঞ্জের মূলস্রোতের পরিচালকদের মতো তাঁর জোহুজুর হবেন না। উত্তমকুমার তখন কিংবদন্তি মহানায়ক হলেও শক্তি সামন্ত ছিলেন তাঁর মতে অনমনীয়। ফলে উত্তম মেনে নিলে আবার শুটিং শুরু হয়েছিল।

১১

মৃণাল সেন পরিচালিত 'ভুবন সোম' হিন্দি ছবিতে নামভূমিকায় উৎপলের নজরকাড়া অভিনয় সারা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। যদিও তার আগেই খাজা আহমেদ আব্বাসের 'সাত হিন্দুস্তানী' ছিল উৎপলের প্রথম হিন্দি ছবি। এই ছবিতে উৎপলের সহ-অভিনেতা ছিলেন আজকের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন এবং সেটাই তাঁর প্রথম ছবি। অমিতাভ পরে এই সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে এবং

উৎপলের অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে ছিল দারুণ সোচ্চার। 'ভুবন সোম' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য উৎপল শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেতার রাষ্ট্রীয় খেতাব 'ভরত পুরস্কার' পেয়েছিল। তারপর থেকেই উৎপল ভারতীয় ছবির প্রধান ধারার একজন অপরিহার্য শিল্পী হয়ে ওঠে।

মৃণাল (সেন) ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পর্ব থেকেই আমাদের কাছের বন্ধু। ওর স্ত্রী গীতা আমার ঘনিষ্ঠজন। গীতা এল টি জি-র প্রযোজনায় উৎপলের নির্দেশে 'ওথেলো'তে ডেসডিমোনা এবং 'চৈতালী রাতের স্বপ্নে' হেলেনার ভূমিকায় খুব সাফল্যের সঙ্গে রূপদান করেছিল। পরে 'কল্লোল' নাটকে করে শার্দুল সিং-এর স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্র। আমি ও মৃণাল একদম সমবয়সী (দুজনেরই জন্ম ১৯২৩ সালে)। কিন্তু মৃণাল 'দ্য গুরু' ছবির পরবর্তী অধ্যায়ে শত্রুশিবিরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উৎপলের বিরুদ্ধে অনেক অযৌক্তিক কথা বলেছিল। তবে মজার কথা, সেই একই সময়ে মৃণাল তাঁর 'ভুবন সোম' ছবিতে অভিনয়ের জন্য উৎপলকে প্রস্তাব দেয়। উৎপলও আনন্দে নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে প্রাণ ঢেলে কাজ করেছিল। গুজরাটে একমাস ধরে এই ছবির শুটিং হয়েছিল। এই 'ভুবন সোম' ছবির দৌলতেই মৃণালও রাতারাতি ভারতবিখ্যাত হয়েছিল।

মৃণালের আরও কয়েকটি ছবিতে উৎপলের অভিনয় ভোলার নয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প 'গোত্রান্তর' অবলম্বনে 'এক আধুরি কাহানী'তে কারখানার মালিক, 'কলকাতা-৭১' এবং 'কোরাস' ছবিতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ চরিত্রে উৎপলের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক অভিনয় ছবিতে অন্য মাত্রা তৈরি করে। এক আধুরি কাহিনী বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। কিন্তু 'কোরাস' ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল।

হিন্দি চলচ্চিত্রের কয়েকজন বাঙালি পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত, বাসু চ্যাটার্জি, বাসু ভট্টাচার্য, অসিত সেন প্রমুখ উৎপলের প্রতিভাকে সাধ্যমতো ব্যবহার করেছিলেন। এর মধ্যে হৃষীকেশ মুখার্জি ও শক্তি সামন্ত ছিলেন উৎপলের গুণগ্রাহী সুহৃদ। এই সমস্ত ভারত বিখ্যাত সফল, কৃতী পরিচালক উৎপলের সঙ্গ পাওয়ার জন্য শুটিংয়ের সময় তাঁকে বসিয়ে রাখতেন। উৎপল শুটিংয়ের অবসরে সারাক্ষণ গুরুগম্ভীর দর্শনইতিহাস-রাজনীতির কঠিন বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ও তামাশায় সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। শক্তি সামন্ত একবার বলেছিলেন যে, উৎপলের সঙ্গে কোনও ভারতীয় অভিনেতারই তুলনা চলে না। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মহাতারকা স্পেনসার ট্রেসি, অ্যালেক গিনেস কিংবা অ্যান্টনি কুইনের সঙ্গে উৎপলের অভিনয়ের তুলনা করা যায়। হৃষীকেশ মুখার্জি একবার একটি দূরদর্শন সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁর মতে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হলেন উৎপল দত্ত। কিন্তু এটাও ঠিক, বাণিজ্যিক ছবির অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে উৎপলের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। হৃষীকেশের সঙ্গে উৎপলের নিবিড় সম্পর্কের কথাটা বিশেষভাবে বলতে হবে। পঞ্চাশের দশকে পরিচালক বিমল রায়ের সহকারীরূপে হৃষীকেশ বোম্বাই পাড়ি দেয়। তারপর অনেক চড়াই-উতরাই পার করে আরব সাগরের তীরে চলচ্চিত্রজগতে হৃষীকেশ নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সত্তর দশকে হৃষীকেশের 'গুড্ডি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য উৎপলের ডাক পড়েছিল। বয়সে বড় হয়েও হৃষীকেশ তারপর থেকে উৎপলকে 'মামা' বলে ডাকত, উৎপলও তাকে বলত 'ভাগ্নে'। এরপর হিন্দি ছবির মূল ধারায় এই 'মামা-ভাগ্নে' জুটি কয়েকটি অসামান্য ছবি উপহার দিয়েছিল। হৃষীকেশ আমায় বলেছিল যে, উৎপল উর্দু ভাষাটা এত ভাল জানে বলে তার হিন্দি সংলাপ এত সাবলীল ও স্পষ্ট। উৎপলও বলত, সারা ভারতে হৃষীকেশের মতো চলচ্চিত্র সম্পাদক বিরল। উৎপলের পরিচালিত ছবিগুলিতে হৃষীকেশই ছিল সম্পাদক।

উৎপলের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আমাদের দুই পরিবারকে একাত্ম করে ফেলেছিল। হৃষীকেশের ছবিতে অভিনয় করে উৎপল যেন আলাদা একটা আনন্দ পেত। হৃষীকেশ বলেছিল যে, সে বারবার সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' ছবির ক্যাসেটটা চালিয়ে দেখত। তার মতে, উৎপলের এই অভিনয় মেধাসমৃদ্ধ, বহুকৌণিক প্রতিভার একটা সেরা নিদর্শন। হৃষীকেশের 'ঝুট বলে কাউয়া কাটে' ছবিতে উৎপলের রূপদানের কথা ছিল,

আগেই সে চলে যায়। এই দুঃখ হৃষীকেশ কোনও দিন ভুলতে পারেনি। উৎপলের শেষের দিনগুলিতে চিকিৎসার সময়েও হৃষীকেশ বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। আজ 'মামা-ভগ্নে' দুজনেই আমার জীবন শূন্য করে বিদায় নিয়েছে।

আবার মিনার্ভা থিয়েটারের কথায় ফিরে আসি। ষাটের দশকের শেষ পর্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপের অন্দরমহলে সঙ্কটের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। আমাদের আর্থিক সঙ্কট তখন তুঙ্গে। উৎপলের ঘাড়ে মিনার্ভার ঋণের বোঝা বাড়ছে। আমি জানতাম, উৎপলের মতো অস্থির, বেগবান প্রতিভাকে ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। ব্রত। ও যে বাংলা তথা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সব্যসাচী।

এ সময় নানা দুর্যোগের অশনি সঙ্কেতে উৎপলের নিজের হাতে গড়া এল টি জি-র প্রাণশক্তি নিভে আসছিল। অথচ কী আশ্চর্য, এরই কয়েক মাসের মধ্যে উৎপল বাংলা থিয়েটারের মঞ্চে একটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটাল। এই সময়ে উৎপলের লেখা 'মানুষের অধিকারে' নাটকটি মঞ্চস্থ হলে সমালোচক ও নাট্যপ্রেমী দর্শকগণ প্রবলভাবে উদ্বেলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিরিশের দশকে একটি বর্বর কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়ন ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এই নাটক। প্রধানত কোর্টরুম ড্রামার আঙ্গিকে লিখিত এই রাজনৈতিক থিয়েটারে বর্ণবিদ্বেষী শাসকদের বিচারের প্রহসন তুলে ধরা হয়েছিল। ষাটের দশকের শেষে রাজ্যে তীব্র, রাজনৈতিক টালমাটালের মধ্যে এই নাটকের প্রযোজনা বিতর্কের নতুন মাত্রা নিয়ে এল। থিয়েটার দলের সঙ্কট এবং ব্যক্তিগত জীবনে বিতর্কের ঝড়ের মধ্যে নিজের পরিচালনায় এই নাটকে লিবোভিটসের চরিত্রে উৎপলের বর্ণময় অভিনয় দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। সত্যজিৎ রায় মশাই এই নাটক একাধিকবার দেখে বলেছিলেন, লিটল থিয়েটার, গ্রুপ বা এল টি জি পর্বের সর্বোত্তম নাট্য প্রযোজনাতুল 'মানুষের অধিকারে'।

১২

মিনার্ভার জরাজীর্ণ মঞ্চে 'মানুষের অধিকার' বেশিদিন চালানো গেল না। কারণ, উৎপলের সঙ্গে বিভিন্ন যুযুধান রাজনৈতিক মহলের মতানৈক্যের কারণে আক্রমণের সুর ক্রমশ চড়তে থাকে। অন্যদিকে, থিয়েটারের কর্ণধার উৎপলের বিপুল খ্যাতির ওপর কাদা ছিটানোর চেষ্টায় দর্শক সংখ্যায় ভাটা দেখা গেল। থিয়েটার দলের মধ্যেও নানা চক্রান্ত ও ভাঙন প্রকট হয়েছিল। কিন্তু সমবেত প্রতিপক্ষের চক্রব্যূহ আক্রমণের মোকাবিলা করেও থিয়েটারের বিশ্বকর্মা দমে যায়নি। ষাটের দশকের শেষে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণশক্তির উত্থান এবং তার রাজনৈতিক দর্শনের বিষয়ে 'মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে' নামে একটি প্রবন্ধে এই সময়ে উৎপলের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য দেখে সবাই চুপ করে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় উৎপলের বক্তব্য ছিল, পরিচালক রূপে তিনি সবচেয়ে বেশি সফল এই নাটকেই।

আমার প্রচণ্ড আফসোস, মঞ্চস্থাপত্য, পোশাক, সম্মিলিত অভিনয়, মার্কিন গণসঙ্গীতের নিপুণ ব্যবহারে হীরকখচিত এই নাটকের কোনও ভিডিও নেই। পরবর্তী প্রজন্মের দর্শক ও থিয়েটারের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি। সমসাময়িকদের স্মৃতিকথা শুনে এবং নাট্যপাঠেই তাদের তুষ্ট থাকতে হবে। বিদেশের নামী কলেজের দুই তরুণ অধ্যাপক এই নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদও করেছেন। তবে, উৎপলকে নিয়ে গৌতমের (ঘোষ) 'থিয়েটারের সন্ধানে' নামক সুন্দর তথ্যচিত্রেও 'মানুষের অধিকারে' নাটকের কোনও খণ্ডদৃশ্য তোলা যায়নি।

সত্তরের দশকের শুরুতেই উৎপলের বড় সাধের লিটল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে গেল। অনেক স্বপ্ন, পরিশ্রম, মেধা, ত্যাগ দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা উৎপলের এই পেশাদারি থিয়েটার দল ২০ বছর পরে ইতিহাসের গর্ভে আশ্রয় পেল। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন দল পিপলস লিটল থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল। ভূমিষ্ঠলগ্নেই উৎপলের নতুন নাটক 'টিনের তলোয়ার' অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। সত্তরের দশকের সেই

সময়টা বড় ভয়ঙ্কর। রাজনীতির আকাশে শকুনরা ঘুরছে, কারণ শহরের রাস্তায় প্রতিনিয়ত যুবকদের টাটকা লাশ পড়ে আছে। বড় রক্তস্নাত ছিল সেই সময়।

উৎপল তখন কিছুটা জনবিচ্ছিন্ন, একাকী স্রষ্টা। এই চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির মধ্যে উৎপল তার। সৃষ্টির এক চূড়ান্ত স্তরে উপহার দিল 'টিনের তলোয়ার'। এখনও মনে আছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে প্রথম মঞ্চস্থ হল এই নাটক। সারারাতব্যাপী এই নাট্য উৎসবে একই সঙ্গে উৎপলের লেখা 'সূর্যশিকার' ও 'ঠিকানা'-র প্রযোজনাও হয়েছিল। প্রথম রাতেই 'টিনের তলোয়ার' দর্শকদের ভাসিয়ে দিল। মিনার্ভাতেও আমরা জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত ধরে নাটক করতাম। ওখানেও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'অলীকবাবু', 'অঙ্গার', 'কল্লোল' করে আমরা সারারাত ধরে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছি। উৎপল চেয়েছিল এল টি জি পর্বের সেই ধারা নতুন থিয়েটার দলেও অব্যাহত রাখতে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে উনিশ শতকের একটি থিয়েটার দল নিয়ে এই নাটক। কিন্তু তার মধ্যে গোটা সমাজ যেন উৎপলের জাদুকলমে ফুটে উঠেছিল। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ এই কালজয়ী নাটক নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এই নাটক অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা এর গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে। উৎপলের এই অমর সৃষ্টি নিয়ে এখন বহু গবেষণাপত্র রচিত হচ্ছে, নিত্যনতুন বই বেরচ্ছে। আমি সে সব কথায় যাব না।

আমি শুধু উৎপলের নাট্যনির্মাণের হেঁশেলের কথা বলছি। এই থিয়েটারের সূতিকাগারে আমি প্রধান কারিগরকে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি আশ্চর্য ভুবন সৃষ্টি করতে দেখেছি। 'টিনের তলোয়ার' প্রযোজনার আগে দীর্ঘ ন'মাস ধরে মহড়া চলেছিল। সাধারণত উৎপলের পরিচালনায় এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনও নাটকের প্রস্তুতি দেখিনি। এই নাটকে উৎপল মঞ্চের অনেক চমকপ্রদ ব্যবহার করেছিল। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের প্রধান চরিত্র বেণীমাধবের ভূমিকায় উৎপল যেন মঞ্চের জাদুকর। উৎপলের বহুমাত্রিক অভিনয়ে দর্শকগণ আপ্লুত হয়ে যায়। পরে বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায় বলেন যে, 'টিনের তলোয়ার' হল ভারতীয় থিয়েটারের সর্বোচ্চ শিখর। কিন্তু এই যুগান্তকারী নাটক সরকারি নির্দেশে 'অশ্লীল' তকমায় ভূষিত হয়ে নিষিদ্ধ হয়েছিল। সরকারি রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে এই নাটক করার অনুমতি পাওয়া যায়নি। সারা জীবনই প্রতিষ্ঠানের এই অহেতুক অসূয়া ছিল উৎপলের ললাটলিখন।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে আমি বসুন্ধরার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। বাংলা থিয়েটারের একজন প্রতিভাশালী অকালপ্রয়াত অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী একবার আমায় একটা দারুণ কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, নাট্যকার ও পরিচালক উৎপলের থিয়েটারে আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিক দিয়ে আমি ছিলাম, সত্যিকারের ভাগ্যবতী। কেয়ার কথাটি ছিল যথার্থ। আমি 'কল্লোল'-এ কৃষ্ণাবাঈ, 'সূর্যশিকার'-এ উর্মিলা, 'মহাবিদ্রোহ'-এ কস্তুরী, 'স্তালিন-১৯৩৪' নাটকে স্তালিনা, ব্রেখটের 'মাদার কুরাজ'-এর অনুপ্রেরণায় 'হিম্মতবাঈ'-তে নামভূমিকায়, 'একলা চলো রে'-তে যোগমায়া, 'লালদুর্গ'-তে মারিনার ভূমিকায় রূপদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। উৎপলসৃষ্ট নারীচরিত্রগণ সব সময় তার নাটকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ মেজাজের। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বসুন্ধরা অতীতের বাংলা মঞ্চের অভিনেত্রীদের আদলে নির্মিত। উৎপল আমাকে নিয়ে 'শোভার অভিনয় দেখে' কবিতায় লিখেছিলেন—

'তোমার তুলনা শুধু ইতিহাস,
যুগে যুগে যার এক এক রূপ,
প্রতি যুগে যাকে মনে হয়
অনন্য, স্থাণু, অনন্ত
অথচ যার বৈশিষ্ট্য
পরিবর্তন।'

এই সমস্ত কবিতা সারা জীবন ধরেই আমার এগিয়ে চলার পথের প্রেরণা।

উৎপল রচিত যাত্রানাটক এবং পরিচালনার কথা উল্লেখ করতেই হবে। উৎপলের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল যাত্রামাধ্যমের চর্চা। ও বিশ্বাস করত, যাত্রা হল আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির অত্যন্ত জনপ্রিয়, শক্তিশালী ধারা। উৎপল বরাবর বলেছে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা যাত্রাতেই আছে। ষাটের দশকের শেষদিকে উৎপলের লেখা প্রথম যাত্রাপালা হল 'রাইফেল'। একটি যাত্রাদলের হয়ে তিনি এই পালাটি প্রথমে লিখে পড়ে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সমবেত শিল্পীদের মধ্যে দিকপাল যাত্রাভিনেতা পঞ্চু সেন এই সম্পর্কে কিছু মতামত দেন। উৎপল সেই বক্তব্য মেনে নিয়ে আবার সাতদিন দরজা বন্ধ করে পালাটি পুনরায় লেখে। এই বিষয়ে তার পাণ্ডিত্যের কোনও দম্ভ ছিল না। এইবার পালাটি শুনে সকলে ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

তারপর দীর্ঘ ২০ বছর উৎপল হয়েছিল চিৎপুরের একচ্ছত্র অপরিহার্য পালাকার। কিন্তু এক-একটি যাত্রাপালা লেখার পর পরিচালনা করতে উৎপলের যেন অর্ধেক আয়ু কমে যেত। অনেকে অবশ্য বলেছেন যে, যাত্রা রচনা ও পরিচালনায় উৎপল-প্রতিভার চূড়ান্ত বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। অতীতের অনেক খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত যাত্রাভিনেতাকে, উৎপল নিজের ঘরানায় গড়েপিঠে আধুনিক ও পরিণত শিল্পী করে তুলেছিল। আবার চিৎপুর পাড়ায় উৎপলের হাতে একগুচ্ছ দাপুটে প্রতিভাশালী অভিনেতা/অভিনেত্রীর জন্ম হয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্রেখট বিশেষজ্ঞ ও আমাদের বন্ধু ফ্রিৎস বেনেভিৎস উৎপলের 'সন্ন্যাসীর তরবারি' পালাটি দেখে প্রচণ্ড অভিভূত হয়ে বলেছিলেন যে, এটি তাঁর দেখা পৃথিবীর সেরা চারটি নাটকের মধ্যে একটি।

স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লির লালকেল্লায় উৎপল রচিত 'টোটা' নাটক করার প্রস্তাব এসেছিল। পরে উৎপল এই নাটকের নাম পরিবর্তন করে রেখেছিল 'মহাবিদ্রোহ'। ১৮৫৭ সালের গৌরবময় মহাবিদ্রোহ নিয়ে লিখিত এই নাটক। অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে উৎপলের এক অনন্য সৃষ্টি এই থিয়েটার। উৎপল এই নাটকে এক বিদ্রোহী, সংস্কৃতির অনুরাগী কিন্তু মানসিকভাবে দুর্বল বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিল। নাটকের বিষয় নিয়ে জটিল আলোচনায় যাচ্ছি না।

কিন্তু দিল্লির লালকেল্লায় এই নাট্য প্রযোজনা কোনওদিন ভোলার নয়। একদিকে কেল্লার দরবারে অমাত্য-পরিবৃত বৃদ্ধ সম্রাট, অন্যদিকে তানপুরা হাতে বাইজির কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা। তার মধ্যে তাপস সেনের আলোর মায়াজালে লালকেল্লায় যেন ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠল। 'মহাবিদ্রোহ' দেখে দিল্লির আপামর দর্শকসাধারণ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। লালকেল্লায় এই ইতিহাস-নির্ভর নাটক হওয়ার পিছনে তৎকালীন সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সভাপতি উৎপল-অনুরাগী গিরিশ কারনাডের ভূমিকা ছিল প্রধান। দিল্লির সরকারি উৎসবে এই নাটক করায় কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ছিল, সরকারি অনুষ্ঠান কোনও দলের হয় না। মহাবিদ্রোহ নাটকটি কিছু পরিমার্জিত করে উৎপল নিজেই ইংরেজিতে The Great Rebellion নাম দিয়ে অনুবাদ করেছিল। পরে আমাদের দল পি এল টি এই নাটক নিয়ে পূর্ব জার্মানি সফরে গিয়ে খুব সুনাম কুড়োয়।

এই সময়ে সামগ্রিক ভাবে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। আমাদের রাজ্যে তখন সন্ত্রাস আর কালাপাহাড়ি দুঃশাসনের রাজত্ব। তার মধ্যে উৎপল নতুন নাটক 'দুঃস্বপ্নের নগরী' মঞ্চস্থ করেছিল। রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে রচিত এই নাটক সারা দেশের গণমাধ্যমে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কারণ, এই নাটকে সাম্প্রতিক রাজনীতির চেহারাটা উৎপল নগ্ন করে দেখিয়েছিল। তারপর এল সেই থিয়েটারের ইতিহাসের কালো দিন।

স্টার থিয়েটারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে এবং বাধাদানে নাটক হল না। আমাদের শিল্পীরা গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল। আমাদের দলের অভিনেত্রী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় লাঠি পড়েছিল। তাপস সেন শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হলেন। কিন্তু তখনও উৎপল নাটক বন্ধের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু একদল সশস্ত্র দুবৃত্ত আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরে। আমরা নামতে পারলাম না। শেষে স্থানীয় বন্ধুরা প্রায় জোর করে। আমাদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। মজার কথা, কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই ন্যক্কারজনক গুন্ডাবাজিতে পুলিস ছিল নীরব দর্শক। কিন্তু পরের দিন রাজ্যসহ ভারতের সমস্ত বড় দৈনিক সংবাদপত্রে এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবেদন বের হয়। উৎপল নিজের সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' (দেয়ালের লিখন) বুলেটিনে এই ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়েছিল। রাজ্যে শিল্পী, কবি, নাট্যকার, বুদ্ধিজীবীগণ এই ঘটনার নিন্দায় একট প্রতিবাদসভা করেছিল।

বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায় এই নাটক দেখে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি উৎপলকে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দেন এবং অভিনন্দন জানান। পরবর্তী সময়ে রূপকথার মোড়কে তোলা 'হীরক বাজার দেশে' ছবিতে দুঃস্বপ্নের নগরীতে ব্যবহৃত কাব্যে ও ছড়ায় সংলাপ বলার আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করেছিলেন। হীরক রাজার চরিত্রটি অভিনয়ের জন্য সত্যজিৎবাবু উৎপলকেই নির্বাচিত করেন। যে ছবি এখন কিংবদন্তি হয়ে গেছে। উৎপলের মতামত ছিল, 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক তামাশার চলচ্চিত্র।

কিন্তু 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি রচনা ও পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার উৎপলের বিরুদ্ধে একটি ধারায়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল। এখানে বলি, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার এই একই ধারাতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল। উৎপলকে তৃতীয়বারের জন্য গ্রেপ্তার করার তোড়জোড় শুরু হয়। উৎপলও আদালতে পুলিসের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে। নাটকটা কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়ে সারা দেশের ধূমায়িত অসন্তোষ ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের জন্য উৎপল গ্রেপ্তার হয়নি। উৎপল অবশ্য 'শোভাকে' শীর্ষক কবিতায় নিজেকে নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক করে লিখেছিল-

আমি জানি যদি আমি জেলে চলে যাই
তুমি পোড়-খাওয়া যোদ্ধার মতন,
হঠাৎ হেসে বলবে, একজন গেল খরচের খাতায়
রইল বাকি নয়।

সে একটা সময় গেছে বটে। উৎপল মঞ্চে যা করেছে তাই হয়েছে ইতিহাস।

১৪

সত্তর দশকের মাঝামাঝি ঋত্বিক (ঘটক) চলে গেল। এই নিদারুণ অকালমৃত্যু বোধহয় অনিবার্য ছিল। কারণ মরণের হাতছানিতে জীবন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলে গেল। ঋত্বিকের প্রতিভার শোচনীয় অপচয় বাংলা সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু এই দুঃসংবাদ বোধহয় প্রত্যাশিতও ছিল।

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে উৎপলের সঙ্গে ঋত্বিকের সখ্যতা গড়ে ওঠে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আদি পর্বে উৎপলের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকেও ঋত্বিক রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। যদিও সেই প্রযোজনার মান সম্পর্কে উৎপল প্রচণ্ড আশাহত হয়। তার প্রধাণ কারণ তখন আই পি টি এ তে কোনো পেশাদারি দক্ষতা ও শৃঙ্খলা ছিল না। তার শিল্পে শৃঙ্খলাহীনতা ছিল উৎপলের দুচক্ষের বিষ। তারপরেও ঋত্বিকের অনুদিত বিশ্ববিখ্যাত রুশ নাট্যকার গোগোলের

'অফিসার' নাটকটি উৎপল পরিচালনা করেছিল। এই নাট্যাভিনয় পরিচালনা করে উৎপল পরিতৃপ্ত হয়েছিল। কারণ ততদিনে আই পি টি এ একটি পেশাদার নাট্যদলের মতো গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। ঋত্বিকের স্বরচিত 'দলিল' নাটকটিতে উৎপল নিজে হরেন পণ্ডিতের চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছিল। সে সব কতদিনের কথা।

ঋত্বিককে প্রথম দেখি নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবির পর। দীর্ঘকায়, শীর্ণ টগবগে যুবক। তারপর ঋত্বিকের পরিচালনায় 'নাগরিক' ছবিতে অভিনয় করেছিলাম।

তখনো সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পায় নি। কিন্তু সে ছবি মানুষ দেখলো ঋত্বিকের মৃত্যুর পর। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 'নাগরিক' ছবির মুক্তির জন্য আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ব্যবসায়িক চক্রের খেলায় আমরা সফল হতে পারিনি। ঋত্বিকও কোনোদিন মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আপোষ করতে চায়নি।

ঋত্বিকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও প্রীতিমূলক। সে ছিল আমার ছোট ভাইয়ের মতো। কিন্তু ঋত্বিককে কেন্দ্র করে আমার প্রথম স্বামীর কদর্য দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। উৎপলের সঙ্গে আমার বিয়ের পর ঋত্বিকের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। উৎপল ও ঋত্বিক দুজনেই ছিল উদ্দাম সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। তাদের দুজনের বন্ধুত্বও ছিল শেষ দিন পর্যন্ত অটুট। ঋত্বিকের প্রথম অসমাপ্ত 'কত অজানারে' ছবিতে এক বিশিষ্ট চরিত্রে উৎপল অভিনয় করেছিল। কিন্তু মাঝ পথে তার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঋত্বিকের জীবনের শেষ আত্মজীবনীমূলক ছবি 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'তে উৎপল একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করেছিল। মাত্র ৫০ বছর বয়সে ঋত্বিকের মতো প্রতিভার অকাল প্রয়াণের যন্ত্রণা আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। তার একটি বড় কারণ ঋত্বিক কোনদিন উৎপলের মতোই সরকারি আনুকূল্য পায়নি। উৎপল ও আমি হাসপাতালে ঋত্বিককে শেষবারের মতো দেখে এলাম।

সত্তর দশকের মধ্যলগ্নেই উৎপল 'তরুণ অপেরা' যাত্রাদলের 'মাওৎসে তুঙ' পালাটি পরিচালনা করে। যাত্রা নাটকটি উৎপলেরই রচিত। একথা সর্বজনবিদিত যে, উৎপল চিৎপুরের যাত্রাজগতে নতুন ধারার জনক 'রাজনৈতিক যাত্রাপালার পুরোধা' বস্তাপচা, সেন্টিমেন্টাল সর্বস্ব বিষয়ের জগদ্দল পাথর ভেঙে উৎপলের বিভিন্ন রাজনৈতিক পালা যেন ভারতের ইতিহাসকে মূর্ত করে তোলে। পৃথিবীর বহু দিকনির্দেশক ঘটনাবলীও উৎপলের যাত্রাপালায় প্রাণ পেয়েছিল।

তরুণ অপেরার এই যাত্রাপালাটি উৎপলের প্রিয় দার্শনিক / জননায়ক গণচীনের রূপকার মাওৎসে তুঙয়ের রোমাঞ্চকর জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। উৎপলের এই যাত্রানাটকটি প্রথমে 'রাইফেলের অরণ্য এগিয়ে চলেছে' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পালার নামভূমিকায় শান্তিগোপাল এবং চিয়াং কাইশেকের চরিত্রে গৌতম সাধুখাঁ দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিল। শান্তিগোপাল তখনই খুব খ্যাতিমান অভিনেতা, কিন্তু উৎপলের হাতে তৈরি গৌতম সাধুখাঁ তার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছিল। উৎপল পরে বলেছিল, যাত্রার গৌতম আমার আবিষ্কার। পরবর্তী সময়ের চিৎপুর পাড়ার অনেক তারকা অভিনেতা / অভিনেত্রী, যেমন অনাদি চক্রবর্তী, শেখর গাঙ্গুলি, শিবদাস মুখার্জি, নিরঞ্জন ঘোষ, ইন্দ্র লাহিড়ী, বর্ণালী ব্যানার্জি, জয়শ্রী মুখার্জি প্রমুখ উৎপলের ছাত্রছাত্রী। এইসব প্রতিভাশালী আধুনিক অভিনয়শৈলীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তারকারা বাংলার যাত্রাজগতের ভোল বদলে দিয়েছিল।

জরুরী অবস্থার শ্বাসরুদ্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'জনঅরণ্য' মুক্তি পায়, যাতে এই প্রথম উৎপল অভিনয় করেছিল। সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে উৎপলের যদিও তার আগে দুদশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বলাই বাহুল্য, দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী এই দুই সাংস্কৃতিক জ্যোতিষ্ক পরস্পরের প্রতিভার প্রতি ছিল শ্রদ্ধাশীল। সত্যজিৎ বাবু আমাকে একদিন প্রশ্ন করেন, 'উৎপল এত

কাজ করে, লেখ কখন?’ উৎপল তার মননঋদ্ধ ক্ষুরধার প্রবন্ধসংকলন ‘জপেন দা জপেন যা’ বইটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যজিৎ বাবু উৎসর্গ করেছিল।

মধ্যসত্তরে স্বৈরাচারী শাসনের কৃষ্ণপক্ষ সময়ে ‘জন অরণ্য’ ছবিতে আমরা দেখি শুধু রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার নয়, মেধাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকার এবং নৈতিক অধঃপতন। সত্যজিৎ পরিচালিত এই কঠোরতম রক্তহিম করা ছবিতে উৎপল ‘বিশুদা’ নামে একটি ছোট চরিত্রে রূপদান করে। ‘জন অরণ্য’ মুক্তি পাবার পর সত্যজিৎ বাবুকে একটি চিঠিতে উৎপল লিখেছিল –

‘সেই যে ব্রেখট কবিতা লিখেছিলেন –
ভবিষ্যতে কেউ বলবে না
হিটলারের যুগ ছিল অন্ধকার যুগ,
শুধু জিজ্ঞেস করবেঃ কবিরা নীরব ছিল কেন?
উত্তরে আমরা বলবো, আমাদের কবি নীরব থাকেন নি।
এটা একটা আত্মজাতির গর্ব।’

সত্তর দশকের শেষদিকে সত্যজিৎ রায়ের ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ ছবি মুক্তি পেলে মানুষ অবাক হয়ে দেখতে পেল মগনলাল মেঘরাজ রূপী উৎপলকে। সত্যজিৎ সৃষ্ট ফেলুদার রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের এই গল্পে উৎপলের চলচ্চিত্রে অভিনয় এক প্রখর, সুমহান উচ্চতায় পৌঁছে যায়। চোরাকারবারি, অন্ধকার জগতের পাণ্ডা মগনলালের আশ্চর্য আধাহিন্দি- আধাবাংলা টানের সংলাপ ও উচ্চারণ এবং সমস্ত শরীরের অননুকরণীয় ভাষা পর্দায় উৎপলের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। সত্যজিৎবাবু এই ছবিতে উৎপলের অসামান্য অন্তর্ভেদী চোখের কাজ ব্যবহার করেছিলেন। কারণ এইরকম জ্বলন্ত অভিব্যক্তি-সক্ষম চোখের ক্ষুরধার দৃষ্টি বাস্তবিক বিরলের মধ্যে বিরলতম। পরবর্তী সময়ে সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে উৎপলের এই ছবিতে অভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি একদিন সকালে আমাদের ‘কল্লোল’ বাড়িতে এসে হাজির হন জগদ্বিখ্যাত মার্কিন নাট্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক হ্যারল্ড ক্লারম্যান। এই সাক্ষাৎকার ছিল পূর্বনির্ধারিত। সে সময় ক্লারম্যান কলকাতায় এসেছিলেন আধুনিক মার্কিন ও ‘ব্ল্যাকড্রামা’ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। এই সুযোগে উৎপলের সঙ্গে ক্লারম্যানের একটি দূরদর্শন সাক্ষাৎকার আয়োজন করা হয়েছিল।

হ্যারল্ড ক্লারম্যান তখন পৃথিবীতে ইংরেজি নাট্যকলার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। গত শতকের তিরিশ থেকে চল্লিশের দশকে ক্লারম্যান ছিলেন নিউইয়র্কে গ্রূপ থিয়েটার আন্দোলনের স্থপতি ও বিশিষ্ট পরিচালক। পঞ্চাশের দশকেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যবিশারদ ও সমালোচকে পরিণত হয়েছিলেন।

কলকাতায় তখন শীতের বিদায়বেলা। টালিগঞ্জে আমাদের ‘কল্লোল’ বাড়িতে উৎপল ও আমি অপেক্ষমাণ। আমাদের পি এল টি নাট্যদলের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। সকালেই ক্লারম্যান এলেন। সাহেব স্যুট পরিহিত এবং মুখে জ্বলন্ত চুরুট। উৎপল বাড়ির গেটে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে ‘কল্লোল’-এর ভিতরে নিয়ে এল সাহেবকে। ক্লারম্যানের তখন মধ্যসত্তর, কিন্তু যুবকের মতো প্রাণবন্ত ও তরতাজা।

তারপর সেই বিদগ্ধ ও মননসমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছিল অনেকসময় ধরে। সরকারি দূরদর্শন সংস্থার কর্মীরা যত্ন করে ক্যামেরা, ভিডিও টেপ নিয়ে সেই অমূল্য সাক্ষাৎকারের ছবি ধরে রাখছিল। উৎপলের শাণিত প্রশ্নের উত্তরে খুব সাবলীলভাবে সেই জ্ঞানবৃদ্ধ মার্কিন নাট্যবোদ্ধা অনর্গল বলে চলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীরব শ্রোতা। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যব্যক্তিত্বদের তত্ত্ব, অবদান এবং এই আন্দোলনের ইতিহাসের নির্যাস উৎপল কী বিস্ময়কর ভাবে আত্মস্থ করেছে।

সেই আলোচনার শুরুতে উৎপল খুব বিনীতভাবে অনুরাগী ভক্তের মতো বলেছিলেন, আপনার মুখোমুখি হয়ে আমার মুখে কথা জোগাচ্ছে না, কারণ আমরা যখন থিয়েটারে কাজ শুরু করি তখন আপনি ছিলেন আমাদের আদর্শস্বরূপ। তারপর সেই সাক্ষাৎকারে ব্রেখট, স্তানিসলাভস্কি, পিরানদেল্লো, ইউজিন ও নীল,

চেকভ, ক্লিফোর্ড ওডেট্স্ ও ভাখতানগভ একে একে সকলের থিয়েটার, নাট্যতত্ত্ব এবং অবদান সম্পর্কে মত বিনিময় হয়েছিল। অবশ্য নাটকের সঙ্গে এই তাবড় দিকপাল নাট্য- নক্ষত্রদের তাত্ত্বিক মতবাদ এবং বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গও এসেছিল। ভাগ্যিস, আমাদের এপিক থিয়েটারের 'দেয়ালের লিখন' বুলেটিনে এই প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল – তাই বর্তমানের পাঠক, গবেষক ও বোদ্ধারা এই সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

অন্য এক বিশ্ববিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রিচার্ড শেখনার ছিলেন উৎপলের বিশেষ গুণগ্রাহী। শেখনার মার্কিন পরীক্ষাবাদী থিয়েটারের জন্মদাতা পরিচালক। কিন্তু উৎপল তার ধারালো প্রবন্ধে মার্কিনমুলুকে শেখনারের নাট্যপরীক্ষাকে অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের কবরখানা বলে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। উৎপলের বক্তব্য ছিল যে, রিচার্ড শেখনার অত্যন্ত শক্তিমান নাট্যপরিচালক। আধুনিক রঙ্গমঞ্চে শেখনারের সৃজনশীলতাকে কুর্ণিশ জানাতে হবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর 'পারফর্মেন্স গ্রুপ' আদতে নাট্যশালায় যৌনব্যভিচারের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

শেখনার কলকাতায় এলেই একাধিকবার আমাদের 'কল্লোল' বাসভবনে এসে উৎপলের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তখন মতাদর্শ ও নাট্যদৃষ্টিভঙ্গির বাইরে দুই মহারথীর আলাপচারিতা দেখার মতো। নব্বই-এর দশকের শুরুতে ইংল্যান্ডের ল্যাংকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক থিয়েটার সম্মেলনে ভারত থেকে উৎপলই একমাত্র বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পায়। বিশ্বখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যকারদের সামনে উৎপলের শেষ দেখা হয়েছিল। শেখনার ছিলেন প্রকৃত মুক্তমনা, উদার বুদ্ধিজীবী। উৎপল এই মার্কিন নাট্যবিশারদকে প্রবলভাবে নস্যাৎ করলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে তা গ্রহণ করেন নি। উৎপলের প্রতি শেখনারের মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার কোনো চিড় ধরে নি। শেখনার সম্পাদিত বিশ্ববিখ্যাত 'দ্য ড্রামা রিভিউ' (টি ডি আর) পত্রিকায় তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন নাট্যপরিচালকদের মধ্যে উৎপলকে অন্যতম অভিহিত করে বিশেষ সম্মান ও মান্যতা দিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক এবং ব্রেখট বিশেষজ্ঞ ফ্রিৎস বেনেভিৎসের কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল পূর্ব জার্মানিতে। তারপর মাঝেমাঝেই ব্রেখটের ভাবশিষ্য এই শক্তিশালী নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের দেশে-বিদেশের বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে সত্তর দশকের মাঝামাঝি উনি কলকাতায় এলে বেনেভিৎসের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

আসলে সেবারেই বেনেভিৎস প্রথম কলকাতায় এসে 'টিনের তলোয়ার' এবং 'টোটা' বা অন্য নামে 'মহাবিদ্রোহ' নাটক দেখে উৎপলের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বেনেভিৎস বলেছিলেন যে উৎপলের মতো নাট্যকার শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই বিরল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'মহাবিদ্রোহ' নাটকের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখে তিনি উৎপলের প্রতিভা সম্পর্কে আপ্লুত হয়েছিলেন। বেনেভিৎসের পরিস্কার বক্তব্য ছিল যে, উৎপলের সৃষ্টিতে ব্রেখটের নাট্যরীতির ছাপ খুব স্পষ্ট। এরপর দর্শকদের মধ্যে চায়ের ভাঁড় হাতে বসে যাত্রার আসরে 'সন্ন্যাসীর তরবারি' দেখেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই পালা ওঁর দেখা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা।

এরপর আশির দশকের শেষদিকে এই জার্মান সাহেব আমাদের 'কল্লোল' বাড়িতে এসে একমাস ছিলেন। সেইসময় আমরা ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' নাটকের একটি নির্বাচিত অংশ গোর্কি সদনে মঞ্চস্থ করেছিলাম। বেনেভিৎস আমাদের বাড়িতে থাকাকালীন এই বিশ্ববিখ্যাত নাটকের ওই অংশটি পরিচালনা করেছিলেন। ব্রেখটের মন্ত্রশিষ্য বেনেভিৎসের নাট্য পরিচালনার ধরণই ছিল আলাদা। আমাদের নাট্যদলের সদস্যরা তাঁর প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ হয়েছিল নিশ্চয়।

'কল্লোল' বাড়িতে ফ্রিৎস বেনেভিৎসের সঙ্গে একমাস আমাদের অবিস্মরণীয় দিন কেটেছিল। উৎপলের সঙ্গে বেনেভিৎসের নানা বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা চলতো। যেহেতু উৎপল জার্মান ভাষায় পারদর্শী, তাই ওঁদের ওইসব জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তায় আমরা প্রবেশ করতে পারতাম না। কিন্তু বেনেভিৎস ছিলেন অত্যন্ত

ঘরোয়া, আমুদে এবং ভোজনপ্রিয় একজন মানুষ। সাহেব একটি লুঙ্গি পরে 'কল্লোল' বাড়িতে একমাস কাটিয়ে দিলেন। আবার রাস্তার ফেরিওয়ালার কাছে ফুচকাও খেতেন। তিনি একজন গোমড়ামুখো, শুকনো পণ্ডিত ছিলেন না। থিয়েটারের বাইরে তিনি আড্ডাবাজ, খোলামেলা, দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন। তাই উৎপলের সঙ্গে তার খুবই সখ্যতা গড়ে ওঠে। বেনেভিৎস ছিলেন পৃথিবীর প্রথম সারির ব্রেখট বিশেষজ্ঞ, তাই ব্রেখট সম্পর্কে উৎপলের বিপুল পাণ্ডিত্যের বহরে তিনি এতটা অভিভূত হয়েছিলেন।

নব্বই দশকেও ফ্রিৎসে বেনেভিৎস প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতি আমাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। আমি মাঝেমাঝে ভাবি উৎপলের জন্য এই 'কল্লোল' বাড়িটা একসময় ছিল একটা আন্তর্জাতিক চর্চা কেন্দ্র। উৎপলের

দীর্ঘ থিয়েটারের জীবনে তাঁর কাছে বহু ছাত্র প্রশিক্ষণ পেয়ে অভিনয় করতে শিখেছে। বছরের পর বছর থিয়েটারের মহলার সময় উৎপল ছিলেন দ্রোণাচার্যের মতো। কিন্তু আমাদের এই পোড়া দেশে তার কোনও মর্যাদা হল না।

১৫

নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়লেই উৎপল যেন সেই যুদ্ধের পুরোভাগে পদাতিক। তখন মননের অতলান্ত অবগাহন থেকে উঠে উৎপল সমুদ্র মন্থনের কাণ্ডারি। কিন্তু অমৃতভোগের লোভে নয়। এই মহাযজ্ঞে বিষপান করে সে বারবার নীলকণ্ঠ হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ৪০ বছর ধরে সেই ইতিহাসের কোনও তালভঙ্গ হয়নি। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে মহেশতলা উপনির্বাচন। তখন উৎপলের সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এটা কেন হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইতিহাস উৎপলের জীবন গবেষণায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।

কিন্তু উপনির্বাচনের যুদ্ধক্ষেত্রে মহেশতলায় উৎপল অগ্রণী সৈনিক। পানু পালের লেখা 'ভোটের ভেট' ছিল তাদের প্রচারের হাতিয়ার। তখন 'উৎপল দত্ত সম্প্রদায়'-এর নামে পথনাটক হচ্ছিল। মহেশতলা, মেটিয়া বুরুজ, নুঙ্গি থেকে বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত তার সীমানা। উৎপল ছাড়াও দলে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, পানু পাল, শান্তনু ঘোষ, প্রেমাশীষ সেন প্রমুখ।

এই উপনির্বাচনের মধ্যমণি কাণ্ডারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার দর্জি শ্রমিকদের অবিসংবাদী নেতা আবুল বাসার। পরে উৎপল বলেছিল, শিবুদা (আবুল বাসার) আমার রাজনৈতিক গুরু। প্রায় ৬০ বছর আগের কথা। তখনই বাসার সাহেবের মধ্য বয়স। ওইরকম নিবেদিত প্রাণ, নিরহংকারী, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মানুষ আর দেখিনি।

একমাস এই উপনির্বাচনের জন্য উৎপল ওই অনুন্নত মুসলিম অধ্যুষিত বস্তিতে কাটিয়েছিল। পথনাট্য দলের অন্য সদস্যতা কলকাতায় আসা যাওয়া করত। কিন্তু উৎপল ওই মুসলিম অঞ্চলের দর্জিদের সঙ্গে নিত্য খাওয়াদাওয়া সেরেছে, থেকেছে। এই নিয়ে কখনো কোনো অভিযোগ করেনি, কোনও অসুবিধার কথা জানায়নি। বরং উৎপল পরে বলেছিল যে, ওইসব সর্বহারা মুসলিম দর্জি ও বিড়ি শ্রমিকদের কাছে সে মানুষকে ভালবাসতে শিখেছিল। উৎপলের বক্তব্য ছিল মাওৎসে তুঙ বলেছিলেন, মাটির কাছের মানুষ হল রাজনীতির আসল শিক্ষক।

মহেশতলা, নুঙ্গি, বাটা, বজবজ এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা উৎপলকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসেছিল। তারাই পথনাটকের অভিনেতাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। খাওয়া মানে শালপাতায় যতখুশি ভাত, ডাল, কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, নুন। তারপর বিরাট সাইজের ট্রাকে করে ঘুরে ঘুরে পাড়ায় পাড়ায়, বাটা কারখানার গেটে, অজ পাড়া গাঁয়ে পথনাটক। একমাস উৎপলরা ওই বিশাল অঞ্চল চষে ফেলেছিল। রাতে ওই সব বিড়ি শ্রমিক নয়তো দর্জিদের জীর্ণকুটিরে শুয়ে উৎপল, আবুল বাসার সাহেবের সঙ্গে দেশের

পরিস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতো।

মহেশতলা উপনির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। পরে আবুল বাসার লিখেছিলেন যে, এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মুজাফ্‌ফর আহমেদ ও জ্যোতিবাবু। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যে, এই উপনির্বাচনে যিনি তাঁদের প্রার্থীকে জনতার কাছাকাছি এনে দিতে আসল কারিগর ছিলেন, তিনি হলেন উৎপল দত্ত।

উৎপল তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচিত বই সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তির নেপথ্যকাহিনী 'প্রতিবিপ্লব' শিবুদাকে (আবুল বাসার) উৎসর্গ করে লিখেছিল, 'আমার অন্যতম পথপ্রদর্শক কমরেড আবুল বাসারকে।' উপনির্বাচনে জেতার পরে উৎপলদের বিদায়ের কালে বিষাদের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। এই সময়ে উৎপল বলেছিল, শিবুদার মতো স্নেহপ্রবণ, শ্রদ্ধেয় মানুষ পৃথিবীতে খুব কম দেখেছি।

এই শতকের গোড়ায় বাসার সাহেবের উদ্যোগে মহেশতলায় নির্মিত হয় উৎপল দত্ত মঞ্চ। এই মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। বাসার সাহেবের কাছে এই নাট্যমঞ্চ স্থাপন ছিল উৎপলের অবদানের স্বীকৃতি। আমার এখনো মনে আছে, ৬০ বছর আগে উপনির্বাচনে জেতার পরে উৎপলদের বিদায়ের দিনে মুসলিম দর্জিদের উৎসব 'দলীজে' সকলের নেমন্তন্ন। সন্ধ্যায় বিরাট ভোজসভায় বিরিয়ানি, মাংস, মিষ্টি পরিবেশন। বাসার সাহেব ঘুরে ঘুরে সকলকে যাচাই করে খাইয়ে চলেছেন।

ওই পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে এন্টালি উপনির্বাচনে উৎপল একটা পথনাটক করেছিল, 'সৌরিন মাস্টারের সংসার।' এটাও সেই 'উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায়'-এর প্রযোজনা। সি আই টি পদ্মপুকুরে অভিনয় শুরু হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হল। একদল দুষ্কৃতি মঞ্চের দিকে ইট ও বোমাবৃষ্টি শুরু করলো। মঞ্চের সামনেই বসেছিলেন শ্রদ্ধেয়া মণিকুন্তল সেন। ইটের আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। অবশ্য আই পি টি এ-র এই বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কর্মী তখনো অবিচলিত। কিন্তু অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল। স্থানীয় মানুষ অসম সাহসে বুক দিয়ে শিল্পীদের রক্ষা করেছিলেন। এই কাপুরুষোচিত হামলা প্রতিবাদে বিরাট মিছিল হয়েছিল।

উৎপল অবশ্য বলতো যে, নির্বাচনের রণক্ষেত্রে বা প্রচার সভায় পথনাটিকার ওপর আক্রমণ হলে বুঝতে হবে যে তা কার্যকর হচ্ছে এবং সঠিক পথেই আছে। নির্বাচনের ময়দানে উৎপলের পথনাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল তীব্র হাস্যরসের উপাদান। একটা ক্ষুরধার কৌতুক ও তামাশার মোড়কে বলিষ্ঠ সব রাজনৈতিক বক্তব্যে উৎপল মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারতো। এই ব্যাপারে উৎপলের গুরু ছিল রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মুকুটহীন সম্রাট চার্লি চ্যাপলিন। অবশ্য উৎপল শুধু ভোটের উত্তপ্ত আসরে নয়, সারা বছরই রাজনৈতিক প্রচারমূলক নাটক করে গেছে এবং সারাজীবন ধরে।

ষাটের দশকের প্রথমে নির্বাচনের দমকা হাওয়ার মধ্যে উৎপল তার 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটককে আরো আক্রমণাত্মক ও তথ্যসমৃদ্ধ করে মানুষকে মাতিয়ে তোলে। এই পথনাটকটি উৎপল উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর্স কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে লিখেছিল। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকরা সেসময় কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে করে গুণ্ডা ও দুর্বৃত্তদের উত্তরপাড়ায় নিয়ে এসেছিল। তার প্রতিবাদে এই নাটক।

আরও মনে পড়ে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি উৎপল রচিত ও পরিচালিত সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'দিন বদলের পালা' পথনাটক। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এই নাটক রাজ্যে পালাবদলের অন্যতম চালিকাশক্তি। আশির দশকের গোড়ায় দেশে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎপল লিখেছিল তার বিখ্যাত, সাড়া জাগানো 'কালো হাত' পথনাটক। সত্তর দশকের কুখ্যাত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে প্রবীণ জননায়ক হেমন্ত কুমার বসুর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে এই চাঞ্চল্যকর পথনাটিকা। এই নাটকে উৎপল

নিজে একজন ঝানু উকিলের চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছিল, যিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উন্মোচন করেছিলেন।

আশির দশকের শুরুতে পুজোর মধ্যে আকস্মিক এক প্রচণ্ড দুঃসংবাদ। বাংলা থিয়েটারের অনন্য প্রতিভাশালী অভিনেতা ও পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। অজিতেশের বয়স তখন মাত্র ৫০ বছর। বাংলা নাট্যজগতের এই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হবার নয়। আমার ধারণা অত্যাধিক পরিশ্রম এবং মানসিক চাপেই অজিতেশের এই অকাল প্রয়াণ। ওর বাড়ি গেলাম এবং শোকস্তব্ধ হৃদয়ে ফিরে এলাম। বাংলা থিয়েটারে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের সঙ্গেই অজিতেশের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। অজিতেশের সঙ্গে উৎপল বহু বাংলা ছবিতে এক সঙ্গে অভিনয় করেছিল। এই দিকপাল অভিনেতা নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও যাত্রাতেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

অনেক কথা মনে পড়ে যায়। সত্তর দশকের গোড়ায় দিল্লিতে আমাদের দলের 'ব্যারিকেড' নাটক করার কথা ছিল। তখন একটি দক্ষিণঘেঁষা বামপন্থী রাজনৈতিক দল তাতে বাধা দিয়েছিল। তাই নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল হয়। সেইসময় আমাদের পি এল টি নাট্যদলের পক্ষ নিয়ে অজিতেশ আপোষহীনভাবে অনেক লড়াই করেছিল। এমনকি, এই বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লির সেই যুব উৎসবে অজিতেশরা নাটক করতে অসম্মতি জানিয়েছিল। সহযাত্রী থিয়েটার দলের পক্ষ নিয়ে অজিতেশের সেই প্রতিবাদ ও জেহাদ বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অজিতেশের এই গৌরবময় ভূমিকা মনে রাখতে হবে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার পেলাম। সেবার আমার সঙ্গেই এই পুরস্কার পেয়েছিল অজিতেশ। সেবার আমি দিল্লিতে আমার এক বোনের বাড়ি উঠেছিলাম। পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর অজিতেশ ও তার স্ত্রীও আমার সেই বোনের বাড়িতে একসঙ্গে রাতের খাওয়ায় যোগ দিয়েছিল। সেদিনের সন্ধ্যাটা খুব হৈ চৈ করে আনন্দে কেটেছিল। দিল্লিতে তখন মধ্য বসন্ত।

নব্বই-এর দশকের শুরুতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল উৎপলকে মঞ্চের প্রয়োগ নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ সম্মানজনক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার প্রদান করেছিল। প্রয়াত অজিতেশের মা লক্ষ্মীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের নামাঙ্কিত সেই পুরস্কার উৎপলের হাতে তুলে দেন। অকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে অজিতেশের মার হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করে উৎপল। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উৎপল বলেছিল, অনুজের নামাঙ্কিত পুরস্কার গ্রহণ করা অগ্রজের পক্ষে একই সঙ্গে গর্বের ও গভীর দুঃখের ব্যাপার। কারণ এই অকালপ্রয়াত প্রতিভাশালী শিল্পী আমার হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। অজিতেশ ছিলেন সব দিক দিয়ে এক বিরাট মাপের স্রষ্টা। লক্ষ্মীরাণী দেবীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ কালে উৎপল আবেগতাড়িত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, জননী প্রকৃতই রত্নগর্ভা। সমগ্র অকাদেমি সভাগৃহে তখন পিনপতন নীরবতা। তারপরেই সমবেত দর্শকগণ প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।

আশির দশকের শেষলগ্নে প্রধানত দুটি মৃত্যু উৎপলকে তীব্র ধাক্কা দিয়ে যায়। উৎপলের আপাতকঠিন, কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিত্বের বর্মের আড়ালে সেই আবেগপ্রবণ, স্পর্শকাতর চরিত্রটি সহজেও ধরা যেত না। উৎপলের সহোদর ভাই ওর থেকে এক বছরের ছোট নিলীন দত্ত অকালে প্রয়াত হল। উৎপল ও নিলীন ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে যমজ ভাইয়ের মতো বেড়ে ওঠে। বহরমপুরে স্কুলজীবনে দুইভাইকে একসময়ে দেহরক্ষী সহ স্কুলে হতো। কারণ পরাধীন ভারতে অগ্নিযুগের বারুদ ঠাসা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে মহাপ্রতাপশালী জেলার পিতা ছিলেন বিপ্লবীদের টার্গেট।

স্কুলে থাকতেই দুইভাই একসঙ্গে শেকসপিয়ারের কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি করতে শিখেছিল। পরে উৎপলের সঙ্গে নিলীনও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়। নিলীন কলেজে উৎপলের সঙ্গে ইংরেজি থিয়েটারে অংশ নিত এবং ভালো অভিনয়ও করতো। এছাড়া সে লিখতো খুব সুন্দর।

কিন্তু পরে নিলীন চা বাগানে চাকরি নিয়ে চলে গেলে তার সেইসব সৃজনশীলতা বিকশিত হতে পারেনি। শেষ কিছুদিন নিলীন অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমে কাটিয়েছিল। এইসময়ে উৎপল খুব চিন্তামগ্ন ও অস্থির হয়ে

থাকতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন উন্নতি হল না। সহোদর ভাইয়ের এই প্রয়াণ উৎপলকে দারুণ আঘাত দিয়ে গেল। কিন্তু বাইরে থেকে সহজে উৎপলের এই সংবেদনশীল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সহজে বোঝা যেত না।

পি এল টি দলের অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা এবং বহু নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টিকারী কনক মৈত্র আকস্মিকভাবে চলে গেল। এই সময়ে তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের উদ্যোগে উৎপলকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ হচ্ছিল। গৌতম এর আগে উৎপলকে তার 'পার' ছবিতে অভিনয় করিয়েছিল। সেই ছবিতে উৎপলের অভিনয় প্রতিভাকে গৌতম অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিল। বিহারের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অত্যাচারী কুর্মি জোতদারের ভূমিকায় উৎপলের অভিনয় তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু উৎপলকে নিয়ে গৌতমের আসল মহত্তম সৃষ্টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' তখনো তোলা হয়নি।

উৎপলের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বিদ্যাচর্চা, থিয়েটারের অনুশীলন নিয়ে আমাদের 'কল্লোল' বাড়িতে গৌতম কয়েকদিন টানা শুটিং করেছিল। উৎপলের সারস্বত সাধনার প্রিয়স্থান 'কল্লোল'এর খোলা অলিন্দে এবং বসার ঘরে গৌতম দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই 'থিয়েটারের সন্ধানে' তথ্যচিত্রেই উৎপলের কয়েকটি কালজয়ী প্রযোজনার খণ্ডদৃশ্য সুযোগ্যতার সঙ্গে ধরা আছে। যদিও জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায় মিনার্ভা প্রেক্ষাগৃহে শুটিং করা যায়নি বলেই উৎপলের অনবদ্য সৃষ্টি 'মানুষের অধিকারে' তোলা গেল না। আশা করি একদিন গৌতমের তথ্যচিত্র 'থিয়েটারের সন্ধানে' সর্বসাধারণ দেখতে পাবে।

সেই তথ্যচিত্রের কাজেই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উৎপলের 'আজকের শাজাহান' নাটকের অংশবিশেষের শুটিং হচ্ছিল। কিন্তু লাঞ্চ খাওয়ার পরে কনকের রক্তবমি শুরু হল। তাড়াতাড়ি আমাদের থিয়েটার দলের ছেলেরা তাকে কাছেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেল। দুপুরে লাঞ্চে বিরিয়ানি খাওয়া হয়েছিল। ভোজনরসিক কনক যথারীতি আনন্দ করে অন্যদের খাবারেও ভাগ বসিয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তাররা জানালেন বমি বন্ধ হচ্ছে না। কারণ পেটে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। তখন স্যালাইন ও রক্তদান শুরু হল। অবস্থা ক্রমেই খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো। রাতে খবর এলো সেই সঙ্কট আরও বেড়েছে।

পরদিন খুব ভোরে খবর এল কনক আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কনক ছিল উৎপলের খুব কাছের মানুষ, প্রিয় শিষ্য ও অভিনেতা। সকালেই হাসপাতালে গেলাম উৎপলের সঙ্গে। উৎপলকে খুব একটা কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু কনকের নিথর প্রাণহীন শরীর দেখে উৎপল কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাড়ি ফিরে শোকে পাথর উৎপল একটি কবিতা লিখেছিল- 'স্বপ্নভঙ্গঃ বিদায় কনক' উৎপল কবিতায় লিখেছিল –

> '...
> তারপর ওরা চলে যায়
> বড় ক্লান্ত হয়ে, স্বপ্নের বোঝা নামিয়ে রেখে
> মুক্ত এক দেশে, যেখানে মহলা নেই,
> নেই অভিনয়, নেই মুখে রঙ মাখার নিয়ম।
> ...
> বিদীর্ণ স্বপ্নগুলি শুধু পড়ে থাকে উপহাসের মতন।'

শোভা সেন

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের হেলেনে ভাইগেল

পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, ব্যক্তি জীবনের দুর্যোগ (স্বামীর উপর্যপুরি গ্রেপ্তার ও কারাবাস), থিয়েটার দলে ভাঙন ও বিতর্ক যাঁকে দমাতে পারেনি, রাজনীতির পটপরিবর্তন ও অস্থির সময় একজন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসাবে যাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি, সেই শোভা সেনের জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে ঢাকায় মামার বাড়িতে। বাবা ডা. নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন উত্তর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। শিক্ষা শুরু বীণাপাণী পর্দা হাইস্কুলে এবং তারপর বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক। স্কুলজীবন থেকেই অভিনয়ে হাতেখড়ি—পরে বেথুন কলেজে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটক দিয়ে নিয়মিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে শ্রীমতী সেন যখন বেথুন কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ১৯৪২ সালে তার বিবাহ হয় বাবা-মার পছন্দ করা বছর দশেকের বড়ো দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। সেই সময় মহাযুদ্ধের লেলিহান আগুনের গ্রাসে মানুষের জীবন ছারখার। কালোবাজার, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, মড়কের করাল ছায়া। অন্যদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক, কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্কের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের উদ্যোগে এবং কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে জনযুদ্ধের প্রচার। এই অগ্নিঝরা টালমাটাল সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তরফে ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক প্রযোজনা দিয়ে শ্রীমতী শোভা সেনের প্রকৃত অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল।

বিবাহিত জীবনের শুরুতে তিনি প্রথম স্বামীর বামপন্থী মনোভাবের জন্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও গণনাট্যসংঘের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। নবান্ন নাটক করতে গিয়ে শ্রীমতী সেন প্রথম নাট্যশিক্ষকরূপে পান বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্রকে। ভারতীয় থিয়েটারের এই দুই পুরোধার শিক্ষায় তার অভিনেত্রী জীবন শুরু থেকেই ছিল যথেষ্ট পরিণত। বিশ্বযুদ্ধ থামার পর ১৯৪৬ সালে যখন সারা ভারতের সংগ্রামী শ্রমিকদের রেল ও ডাক ধর্মঘটের সাফল্য, বোম্বাইতে তখন ইতিহাস খ্যাত নৌবিদ্রোহের আপোশহীন লড়াইয়ের ধাক্কায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কেঁপে উঠেছে। তখন নোয়াখালি, বিহারের সঙ্গে কলকাতার রাজপথও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রক্তস্নাত, মাথার ওপর দেশ বিভাগের অশনিসংকেত, কারফিউ ও মিলিটারি বুটের কর্কশ পদধ্বনির মধ্যে শ্রীমতী শোভা সেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। তারপর ৪৭ সালে স্বাধীনতা এল এবং ৪৮ সালের শুরুতে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে গান্ধীহত্যা এবং কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে আইপিটি এ-র তরফে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে উৎপল দত্তের পরিচালনায় শ্রীমতী সেন অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৫১ সালে শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও প্রকৃত অর্থে গুরুলাভ হয়নি। ইতিমধ্যে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শোভা সেনের চলচ্চিত্রজীবন শুরু হল। একের পর এক পরিবর্তন, 'বামুনের মেয়ে' এবং ১৯৫১ সালে 'বাবলা' ছায়াছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করে তিনি এই নতুন শিল্পমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৫২ সালে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সাড়া জাগানো 'নাগরিক' ছবিতে শোভা সেনের অভিনয় এক স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু পথের পাঁচালী'র আগে নির্মিত এই ছবি সঠিক সময়ে মুক্তি পায়নি। বাংলা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

অভিনেত্রী প্রভাদেবীর স্নেহধন্যা শোভা সেন বাংলা বাণিজ্যিক ছায়াছবিতে এই সময় বিপুল সাফল্য পেয়েছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকেই শ্রীমতী সেনের পেশাগত জীবনে এক নতুন পর্ব শুরু হল, যা পরবর্তী সময়ে তার ব্যক্তিজীবনেও অনেক ওলোটপালট ঘটিয়ে দেয়। এই সময়ে উৎপল দত্তের ডাকে বাংলায় শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি লিটল্ থিয়েটারে যোগ দিলেন। এক আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক ও শিক্ষকের কাছে শ্রীমতী শোভা সেন প্রশিক্ষণ পেতে শুরু করলেন। একে একে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন ও তপতী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা', মাইকেলের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', বাংলা তর্জমায় গোর্কির নীচের মহল' ইত্যাদি নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী সেন বাংলা থিয়েটারের একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেত্রীতে পরিণত হন। পাশাপাশি, ওই ১৯৫৪ সালেই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'মরণের পরে', ১৯৫৬ সালে 'ত্রিযামা' ও 'শিল্পী' ছবিতে অংশগ্রহণ। ১৯৫৭ সালে 'পথে হলো দেরী' ও 'অভয়ের বিয়ে' ইত্যাদি উত্তম-সুচিত্রা জুটির স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবিতেও তার ভূমিকা নগণ্য নয়।

শোভা সেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'স্মরণে বিস্মরণে—নবান্ন থেকে লাল দুর্গ'-এর ভূমিকায় উৎপল দত্ত নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দুটি প্রধান কথা লিখেছেন। প্রথমত, প্রায়ই অভিনেত্রী শোভা সেনের ভূমিকার তলায় চাপা পড়ে যায় তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক শক্তির অবদান। উৎপল লিখেছেন— 'শিল্পী ও সংগঠনকে যেন একটা অলিখিত বিরোধ আমাদের নাট্যশালাকে বারম্বার জর্জরিত করেছে। যিনি শিল্পী, তার যেন হিসেবি হতে নেই। পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে চলার বাধ্যবাধকতা নেই, এমনকী শৃঙ্খলা মেনে চলারও প্রয়োজন নেই— এই কুসংস্কারে পীড়িত হয়েছে বাংলা নাট্যশালা। পরে তিনি লিখেছেন যে, এলটিজি বা পিএলটি-র স্থিতি ও বিকাশের পিছনে সংগঠকরূপে শ্রীমতী সেনের বিশেষ অবদান স্বীকার করতে হবে। তাঁর ভাষায়— মঞ্চের ওপর তার যে খ্যাতি গড়ে উঠেছে, তার চেয়ে নাট্য আন্দোলনের সফল সম্পাদক হিসেবে তার যশের দাবি কম নয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রীমতী সেনের সাহস, মনের জোর, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচল কঠোর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকার ক্ষমতা। উৎপল দত্ত লিখেছেন—'স্টার থিয়েটারের সামনে দুঃস্বপ্নের নগরী'র ওপর আক্রমণের সময় সশস্ত্র গুণ্ডারাও শ্রীমতী সেনের সামনে এসে অস্ত্র নামিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। এ আমার স্বচক্ষে দেখা।'

১৯৫৯ সালের ৩ জুলাই থেকে এলটিজি মিনার্ভায় নাটক প্রযোজনা শুরু করে। প্রথম দিন অভিনীত হয়েছিল মধুসুদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি। তারপর ওই বছরের শেষদিন ৩১ ডিসেম্বর উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'অঙ্গার' নাটক মঞ্চস্থ হল। সৃষ্টি হল এক ইতিহাস। মিনার্ভা তথা উৎপল দত্তের নাট্যজীবনে এই প্রযোজনা নিশ্চিতভাবে এক ক্রোশফলক। শোভা সেনের ব্যক্তি জীবনেও এই সময়ে দারুণ টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। একদিকে স্বামীর সন্দেহ ও নির্যাতন, মদ্যপান করে এসে শারীরিক অত্যাচার। অন্যদিকে রুগ্ন শিশুপুত্রকে বাপের কোপের থেকে রক্ষা করে স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এরই মধ্যে শোভা সেনকে নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য অবস্থায় রেখে স্বামীর গৃহত্যাগ। উৎপল দত্ত সেই সময়ে বাধ্য হয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের তিনতলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর্থিক সংকট তখন তুঙ্গে। কিন্তু সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতা ও অপপ্রচারের মুখে তুড়ি মেরে 'অঙ্গারে'র বিজয়রথ তখন অপ্রতিহত। অবশেষে যাবতীয় ব্যক্তিগত মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে শ্রীমতী সেন ১৯৬১ সালে দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেন। তারপর গুরুরূপে যাঁকে স্বীকার করেছিলেন, নিজের চেয়ে বয়সে ছোটো সেই প্রতিভাশালী নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তার অভিনেত্রী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শ্রীমতী সেনের এই অসীম সাহসী পদক্ষেপ বুঝিয়ে দেয় তার ব্যতিক্রমী চরিত্রকে।

অবশ্য অতীতেও ব্যক্তিগত জীবনে বারংবার শোভা সেন এই ধরনের মানসিক নিপীড়ন ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। ৫০-এর দশকের শুরুতে তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক মধুর

স্নেহের সম্পর্ক। এই সম্ভাবনাময়, সৃজনশীল পরিচালক তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে শ্ৰীমতী সেনের সহযোদ্ধা। প্রায় একই সঙ্গে ওঁরা বিখ্যাত 'নাগরিক' ছবিটি বানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভ্রাতৃপ্রতিম ঋত্বিককে কেন্দ্র করেও প্রাক্তন স্বামীর ছিল অযথা সন্দেহ, হীনমন্যতাবোধ এবং দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন।

মিনার্ভায় 'অঙ্গার' নাটকের অভাবনীয় সাফল্যের পর 'ফেরারী ফৌজে' বঙ্গবাসী দেবী, 'তিতাস একটি নদীর নামে' বাসন্তী, 'কল্লোলে' কৃষ্ণাবাঈ, 'অজেয় ভিয়েতনামে' কিম, 'মানুষের অধিকারে' নাটকে মিসেস লিবোভিক্স, 'প্রফেসর ম্যামলকে' এলেন ম্যামলক এবং লেনিনের ডাকে আকুলিনা প্রমুখ। চরিত্রে জীবন্ত রূপদান করে শোভা সেন এক অনন্য- সাধারণ প্রতিভাশালী অভিনেত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে 'কল্লোল' নাটককে ঘিরে দেশে যে অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের ঢেউ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শিবির দু-টিকে ভাগ করে ফেলে, নাট্য আন্দোলনের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ তথা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিহিংসামূলক নীচতা যেভাবে নগ্ন হয়ে পড়ে দেশে তার কোনো নজির নেই। নাট্যকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে ৭ মাস কারাগারে দিন কাটান। তখন পুরোভাগে থেকে এই সমস্ত প্রতিকূলতা ও সংকটের মোকাবিলা করতে হয় এই তেজস্বী বীরাঙ্গনাকে।

আবার থিয়েটার দলে ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভেতরে গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র এবং বহিরাগত চাপে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গৌরবময় নাট্যসংস্থা এলটিজি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে ১৯৭১ সালে পিপলস্ লিটল থিয়েটারের অভ্যুদয়ের পর উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার' নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলা থিয়েটারের মানচিত্র বদলে দিয়েছিলেন। ক্রমে 'টিনের তলোয়ার' নাটকে বসুন্ধরা, 'সূর্য শিকারে' উর্মিলা, 'মহাবিদ্রোহে' কস্তুরী, 'স্তালিন-১৯৩৪' নাটকে স্তালিনা, 'মালোপাড়ার মা'তে তহমিনা বিবি, 'একলা চলো রে'-তে যোগমায়া, 'হিম্মতবাঈ'-এর হিম্মত, 'নীল সাদা লালে' মাদাম বুনো, 'লাল দুর্গে' মারিনা প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে শোভা সেন বাংলা মঞ্চে এক কিংবদন্তি মহীয়সী প্রয়োগ-শিল্পীতে পরিণত হন।

বিশ্বের নাট্যজগতের প্রবাদপুরুষ বোর্টোল্ট ব্রেখট যেমন জীবন সঙ্গিনী হেলেনে ভাইগেলকে দিয়ে 'মাদার কুরাজে'র কুরাজ চরিত্রে অভিনয় করিয়েছিলেন, তেমনি উৎপল দত্ত লিখিত 'হিম্মতবাঈ'-এ শোভা সেন একাত্ম হয়ে যান। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে সমানতালে অংশগ্রহণের সঙ্গে উৎপল দত্ত পরিচালিত 'মা' ছবিতে তার যে অভিনয় প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছিল তার তুলনা মেলা ভার।

এই ৩৪ বছরের দীর্ঘ অভিযাত্রাপথে 'অনিশ্চিতের পক্ষপাতী' (শোভাকে : স্বপ্নবিলাসীর কবিতা— উৎপল দত্ত) শ্ৰীমতী সেনের হাতে গণনাট্যের যে মশাল দীপ্যমান, তার আলোয় নিঃসন্দেহে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস আলোকিত হয়ে থাকবে। ভাবীকালের গবেষকরা নিশ্চয় তা নিয়ে চর্চা ও অনুসন্ধান করবেন। সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বে এ এক বেনজির, বিরল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমরা যথার্থভাবে তার মূল্যায়ন করতে পারিনি। তার মধ্যে ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, রাজ্য সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি লিট উপাধি দিয়ে তাকে সম্মান জানিয়েছে।

সারাজীবন ধরেই থিয়েটারের কাজে শোভা সেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। সাবেক জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেক প্রজাতন্ত্র হাঙ্গেরি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালিসহ পশ্চিম ইউরোপের নানা রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও জাপানে বিস্তৃত এই সফর। তিনি লিখেছেন যে এখানেও সৃজনশীল আনন্দের সঙ্গে 'ভ্রমণসঙ্গী উৎপল'–এই সফরগুলিকে সমৃদ্ধ করেছিল। এর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানিতে ব্রেখটের বাসভবন দর্শন এবং ব্রেখটের স্ত্রী পৃথিবীখ্যাত অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেলের আকর্ষণীয় রান্নাঘরটি তার মনে বিশেষ দাগ কাটে। খাদ্যরসিক স্বামী ব্রেখটের রসনাতৃপ্তির জন্য হেলেনে ভাইগেলের এই বিশাল আয়োজন তাকে মুগ্ধ করেছিল।

২০০২ সালে 'ক্ষমা করবো না' নাটকে সফিয়া ফুয়েন্টেসের চরিত্রে তার অভিনয়ের কলাকৌশল আমাদের মনমুগ্ধ করে রাখে। ২০০৬ সালে বাংলা নাটকের ইতিহাসে নারী অভিনেত্রীদের জীবন অবলম্বনে রচিত 'নটী' নাটকেও শোভা সেন ছিলেন মুখ্য আকর্ষণ। ২০০৮ সালে সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে উৎপল দত্ত রচিত 'মহাবিদ্রোহ' নাটকেও তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শ্রীমতী সেন

এক সময় ছিলেন নিরলস, নিয়মিত লেখিকা। তার লেখা 'স্মরণে বিস্মরণে-নবান্ন থেকে লাল দুর্গ'-৫০ বছরের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক ঘটনাবহুল, উত্তাল সময়ের দলিল—যা একই সঙ্গে আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গণদেবতার মহিমান্বিত ছবি। পরবর্তী গ্রন্থ—'ওঁরা, আমরা, এরা'—অগ্রজা, সমকালীন ও অনুজা অভিনেত্রীদের জীবন ও কর্মধারা নিয়ে মানবিক ও শৈল্পিক দৃষ্টিতে এক অনবদ্য জীবনচরিত রচনা করেছেন তিনি।

পরিশেষে বলতে চাই, শোভা সেনের অপাতকঠিন, স্পষ্টবাক, কড়া, রূঢ়ভাষী, প্রবল দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আড়ালে যে বিশাল স্নেহময়ী আধার আছে তার সন্ধান সকলে পাননি। কারণ, সারাজীবন উৎপল দত্তের রাজনৈতিক মতাদর্শে অবিচল থেকে তিনি নিজেকে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিষ্ঠাবান, দক্ষ সৈনিকরূপে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি চূড়ান্ত অনমনীয় ও আপোশহীন। থিয়েটার বা যেকোনো সৃজনশীল কাজে শৃঙ্খলাহীনতা আদর্শহীনতা, প্রবঞ্চনা ও ধাপ্পা তার দু-চক্ষের বিষ। কিন্তু অকৃত্রিম, খাঁটি, স্বচ্ছ, সৎ চেহারার সামনে তিনি মাতৃসমা, মমতাময়ী, স্নেহশীলা—কোমলহৃদয় রমণী।

শোভা সেনের মতো প্রেমিকা আমি দেখিনি। তার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, সমস্ত চিন্তার উৎস সেই অগ্নিগর্ভ প্রতিভাশালী উৎপল দত্ত। তাঁর বিশ্রাম নেই। ক্লান্তি নেই। বয়স তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁর একাকিত্ব নেই। হতাশা তাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না। কারণ—তার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা পরিষ্কার। উৎপল দত্তের মহান, সমৃদ্ধশালী উত্তরাধিকার বহন ও সংরক্ষণ।

-২০১৭ সালে 'আশ্চর্যময়ী' গ্রন্থে প্রকাশিত

“উৎপল আমার জন্যই স্মরণীয় সব চরিত্র সৃষ্টি করেছিল”

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের হেলেনে ভাইগেল

[দূরদর্শনের একটি অধুনালুপ্ত চ্যানেল, এ-টি-এন ওয়ার্ল্ডে বিগত ২০০৪ সালের প্রারম্ভে ‘বাংলা থিয়েটার’ সম্পর্কে এক সপ্তাহব্যাপী একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছিল। সেই সময় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক রূপে আমি বাংলা মঞ্চের বিভিন্ন প্রজন্মের সাতজন নাট্যব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সদ্যপ্রয়াত অভিনেত্রী শোভা সেন-এরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

শোভা সেনের এই সাক্ষাৎকারটি যখন গ্রহণ করা হয়, তখন তার বয়স ৮০ পেরিয়ে গেছে (শ্রীমতী সেনের জন্ম ১৯২৩-এর ১৭ সেপ্টেম্বর)। পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, স্বামী উৎপল দত্তের উপর্যুপরি গ্রেপ্তার ও কারাবাস, থিয়েটার দলের ভাঙন ও তীব্র বিতর্কে উথালপাথাল তার বর্ণময় জীবন। এযাবৎ অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি বর্তমানে মুদ্রিত হল।]— লেখক।

আমার বয়স ৮০ পেরিয়েছে, ৮০+ চলছে। আমার অতি সম্প্রতি হাঁটু প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হলো। আমি এর পরেও নিশ্চয়ই মঞ্চে অভিনয় করবো। অভিনয় করার জন্যই তো এই অপারেশনটা করলাম। না হলে তো পঙ্গু হয়ে যেতাম। আমাকে এত সিরিয়াস সব রোল করতে হচ্ছে। এগুলো আমার থিয়েটার গ্রুপের প্রয়োজনেই আমাকে করতে হয়। উৎপলের অবর্তমানে আমাকে অনেকটাই হাল ধরতে হয়, হয়েছে। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী, যতক্ষণ সে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ততক্ষণ তার অভিনয় করা উচিত— এটা আমার মত, উৎপলও তাই বলতো। যখন সে শুয়ে পড়বে, তখন তো সে আর (অভিনয় করতে) পারবে না। আমি এখনও সেই আদর্শটা মেনেই চলছি।

আমি কীভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে এলাম? জানানোর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম কথা এটাই যে আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমি পড়তাম বেথুন কলেজে— সেই স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই আমি পার্টির সঙ্গে জড়িত এবং পার্টির কাজকর্ম করতাম।

পড়াশুনা ছিল বলে খুব সিরিয়াস কিছু করতে পারতাম না। কলেজ লাইফ থেকেই অভিনয় করতাম। বেথুন কলেজে প্রত্যেক বছরই দুটো করে নাটক হতো— তাতে অভিনয় করতাম। আমার নাটকের ওপর উৎসাহ ছিল ছোট থেকেই। আমি স্কুলে থাকাকালীন তখনই একটা নাটক পরিচালনা করেছি। নাটকটা বাচ্চাদের নিয়েই করেছিলাম। সেই থেকে আমার অভিনয়ের, থিয়েটারের প্রতি একটা আকর্ষণ জাগে, আমি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হই। যদি কোনও সুযোগ আসে, তবে সেটাকে ব্যবহার করবো, এটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি বি.এ. পরীক্ষা যখন পাশ করলাম তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে নাটকের একটা প্ল্যাটফর্ম ভালোমতো তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমে দু-একটা ছোট নাটক করার পর, বড় নাটক হিসেবে নবান্নতে হাত দেওয়া হয়। নাটকটি লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য— তিনি তখনই বিখ্যাত লেখক, অভিনেতা ও পরিচালক হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাথে যোগ দেন শম্ভু মিত্র। তিনিও তখন অভিনয়ে বেশ নাম করেছেন— তিনি তখনই শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্র— এই দুজনে মিলে নবান্ন' নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তখন আমাদের পার্টির সূত্রে বন্ধু ছিলেন, সুধী প্রধান, তিনি এই

নবান্ন নাটকের সংগঠক হিসেবে পার্টির পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিলেন। পার্টির থেকে তাকেই দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করেছিলো। আমার নন্দাই, প্রফেসর শান্তিময় রায়, তিনিও সুধী প্রধানের বন্ধু ছিলেন, আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। তিনি জানলেন যে আমি নাটক করতে চাই, অভিনয় করতে চাই। তারা তখন যে রকম একজন অভিনেতা চাইছিলেন, আমার সঙ্গে তা মিলে যায়।

আমাকে সুধী প্রধান নিয়ে গেলেন বিজন ভট্টাচার্যের কাছে। মূলত দেখাবার জন্য। তখন গণনাট্যের পানু পাল, উষা দত্ত, এঁরা নাচ এবং অভিনয় প্র্যাকটিস করছিলেন। আমি সেগুলো দেখতে যাই। আমারও এগুলো বেশ ভালো লাগলো। এই মহড়াগুলোর সহায়তায় টাকা তোলা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য। দুর্ভিক্ষের জন্য তখন এখানের অবস্থা খুবই খারাপ। স্বাধীনতা তখনও আসেনি। রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ— রাস্তায় মানুষ। মরে পড়ে থাকছে। সে এক ভয়ঙ্কর সময় গেছে। এদিকে যুদ্ধ আর অন্যদিকে কালোবাজারী শুরু হলো। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা— মানুষ রাস্তায় মরে পড়ে থাকছে। বাড়িতে তখন ভাতের ফ্যানটুকুও ফেলা যেত না। (সেই ফ্যান নেওয়ার জন্য) মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

আমরাও তখন টাকা তোলার কাজে নেমে পড়লাম। তখন ছিল রাজনৈতিক আদর্শ আর এর ফলে একটা দায়বদ্ধতা এসে গেল। আমরা থিয়েটারকে বিনোদন হিসেবে দেখিনি— মানুষকে আনন্দ দেব এই চিন্তা ছিল না। এইভাবেই নামলাম। আমরা আসল জায়গাটা বেছে ফেললাম— আমার মনে হল এটাই আমাদের প্রকৃত জায়গা। এই দুটো কারণে।

এখন আমার অভিনয় জীবনের ষাট বছর হয়ে গেলো। আমরা সেই আদর্শ থেকে আজও বিচ্যুত হইনি। অবশ্য গণনাট্য সংঘে এত বছর থাকিনি। আমি প্রথমে গুরু হিসেবে পেয়েছিলাম বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রকে। পরে পেলাম উৎপল দত্তকে।

গণনাট্য সংঘ এক সময় শেকসপিয়ারের জন্মদিন পালন করেছিল। আমাকে তারা তখন ডেকেছিলেন লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। পুরো ম্যাকবেথ নাটকটি অভিনীত হয়নি— কেবল প্রথম অঙ্কটি করা হয়েছিল। এই নাটকে (আমন্ত্রণ পেয়ে) আমার খুব আনন্দ হয়েছিল এই জন্য যে শেকসপিয়ারের নাটক করলে যে কোনো অভিনেতা কিন্তু (নাটক করার জন্য) তৈরি হয়ে যান। লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রটিও ছিল অসাধারণ। নাট্যজগতে এর সমতুল্য কোনও চরিত্র তৈরি হয়েছে কিনা। আমার জানা নেই। প্রত্যেকটি অভিনেত্রীর জীবনে একটা স্পৃহা থাকে ঐ পার্টটা করার।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ বা এলটিজি (পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি) সেইসময় সবে বাংলা নাটক করতে শুরু করেছে। সেই সময় (ওদের পক্ষ থেকে আমার কাছে) ডাক এল। সেই ডাকটি আমি গ্রহণ করি। খুব যে ভুল করিনি তা পরে বুঝেছি। কেননা তখন গণনাট্য সংঘের কাজকর্ম, বিশেষত নবান্নর পরে ধুম-ধাড়াক্কা করে কিছু হয়নি। ওরা আর একটা নাটক বেছেছিল— জীয়নকন্যা। বিজনবাবুরই লেখা। কিন্তু, এই নাটকের প্রতি অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই গান-নাচ-অভিনয় এই তিনটি বিষয়েই পারদর্শী হতে হবে। সেটা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

এলটিজিতে যোগ দিয়ে আমি প্রথমে ঐ লেডি ম্যাকবেথেরই ভূমিকায় অভিনয় করি। তারপর একের পর এক ক্লাসিক নাটকে অভিনয় করি। তখনও উৎপল দত্ত নাটক লিখতে শুরু করেননি। ম্যাক্সিম গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস্'-এর অনুবাদ, 'নিচের মহল' আমরা অভিনয় করি। আমাদেরই একজন, উমানাথ ভট্টাচার্য এই অনুবাদটি করেন। এই নাটকটি আমরা খুব সিরিয়াসলি করতে লাগলাম— নাটকটি খুব আলোড়ন ফেলে। এই সময় মাইকেলের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' অভিনয় করা হয়— এই নাটকে প্রথমে আমি ফতির ভূমিকায় ও পরে পুঁটি-র চরিত্রে অভিনয় করি। দুটি চরিত্রেই অভিনয় করি। দুটো চরিত্রই সম্পূর্ণ বিপরীত। ফতি খুবই মিষ্টি একজন নায়িকা, খুব সাবলীল। পুঁটি হচ্ছে একেবারে বিপরীত। পুঁটি একজন বেশ্যার দালাল। সে জমিদারকে মহিলা সরবরাহ করে। দুটোতেই আমার অভিনয় উত্রে যায়। তখন আমাদের প্রতিবছরই একটা করে নাট্য উৎসব হত। এলটিজি এই উৎসব করত। আমাদের অভিনীত

ম্যাকবেথ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে আমাদের দলের নামই হয়ে যায় 'ম্যাকবেথ পার্টি', গ্রামে-গঞ্জে, যেখানে শেকসপিয়ার কখনও ঢুকতে পারতো না, সেখানেও নাটকটি অসামান্য সাফল্য লাভ করে। আমরা গোগোলের 'ইনসপেক্টর জেনারেল' নাটকটিও করি। মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নেওয়াটা আমাদের একটা যুগান্তকারী কাজ। হলটি দলের নামে লীজ নেওয়ার কথা হয়। আমাদের তখনকার মালিক কিন্তু দলের নামে করতে চাইলেন না। আমাদের দলের একজন, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এসে জানালেন যে মিনার্ভার মালিক লীজ দিতে চাইছেন। এই মওকায় আপনারা চেষ্টা করুন। থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা করবো বা কোনো ব্যবসায়িক বুদ্ধি তখন আমাদের একেবারেই ছিল না। এই বিষয়ে আমাদের কোনো রকম অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু উৎসাহী একদল তাজা ছেলেমেয়ে— তাদের কীরকম যেন জেদ চেপে গেল। আমরা করবই— রাস্তার কলের জল খেয়েও আমরা করবো। চিনা বাদাম খেয়েই করবো। কিন্তু করতে হবে। এই একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা নেমে পড়লাম।

কিন্তু আমাদের কাছে টাকা তো নেই। আমাদের আর এক বন্ধু তিনি টাকা জোগাড় করে দেবেন, কিন্তু একজন গ্যারেন্টার চাই। তখন গ্যারেন্টার হিসেবে আমি ছাড়া এমন কোনো ছেলে বা মেয়ে ছিল না, যার বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকার সংস্থান হল।

'অঙ্গার'-এ অসাধারণ সাফল্য এল ঠিকই কিন্তু আমরা তো শুরু করেছিলাম 'নিচের মহল' বা 'ছায়ানট' দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকও আমরা মাঝে মাঝে করতাম। কিন্তু সেটা জমলো না। একটা বিষয় আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। মিনার্ভা থিয়েটার যেহেতু উত্তর কলকাতায়, আমাদের দর্শক ছিল হাতিবাগান বাজারের আলুওয়ালা, পটলওয়ালাবাজার শেষ হলে তারা নাটক দেখতে আসতো। সেই দর্শকদের 'নিচের মহল' দেখালে তো চলবে না। এই বিষয়টা বুঝতে আমাদের বেশ কিছুদিন কেটে গেল। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হল আমাদের প্রচুর লস খেলাম। আমাদের পুরো টেকনিসিয়ান দলের ভার বইতে হত। এই সব পাওনা মিটিয়ে আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একটা পয়সাও পেতাম না।

যখন টাকা থাকতো, তখন হয়তো ট্যাক্সি ভাড়া পেতাম— তাও মাঝে মাঝে জুটতো না। 'অঙ্গার' নাটক ভারতীয় থিয়েটারে এই প্রথম লেখা যেখানে শ্রমিকরা স্টেজে এলেন এবং নায়কের ভূমিকায়। নাটকটি লিখলেন উৎপল দত্ত। সঙ্গে ছিল তাপস সেনের আলো এবং রবিশঙ্করের আবহসঙ্গীত। প্রত্যেকটি শো-তে নির্মলেন্দু চৌধুরী তাঁর দল নিয়ে এসে গান করতেন। তার জন্য উনি কোনো পয়সা নিতেন না। যখন পারতাম তখন আমরা কিছু যাতায়াত ভাড়া দিতাম। তিনি নিজের থেকে, থিয়েটারকে ভালোবেসে, উৎপল এবং আমাদের সকলকে ভালোবেসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সঙ্গে ছিল টিমের অভিনয়— 'অঙ্গার' অসাধারণ সাফল্যলাভ করল। স্টেজের বৈজ্ঞানিক দিকটি এই প্রথম বাঙালি দর্শক দেখলো— এখানে একজন কারুর নাম বিশেষ করে বলা যাবে না। যদি আদৌ কোনো নাম করতে হয় তো আমি রবি ঘোষের নামটাই বলব। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয় অসাধারণ হয়েছিল। এই টিম ওয়ার্কের যে জোরের জায়গাটা, সেটা আমরা গণনাট্য থেকেই পেয়েছিলাম।

উৎপল থিয়েটারের প্রত্যেকটি অংশ ব্যবহার করেছে। একটি সামগ্রিক থিয়েটার— মঞ্চের ওপর নিচ, পুরোটাই সে ব্যবহার করেছে। এই সবই ছিল আমাদের সাফল্যের মূল।

একটা কথা এখানে বলতে হবে যে আমরা কখনও কোনো কাগজ থেকে বা রাজনৈতিক দল বা শাসক পার্টির কারোর কাছ থেকেই কোনো সাহায্য পাইনি। বরং আমাদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আমাদের কেউ সমর্থন করেনি। এত ভালো ভালো নাটক আমরা করেছি, কিন্তু কাগজে তার বিরুদ্ধ সমালোচনাই হয়েছে। ষাটের দশকে আমাদের একটা অসাধারণ নাটক 'ফেরারী-ফৌজ' হয়েছিল, কিন্তু কাগজে তার সমালোচনা বেরুলো যে তা 'আবর্জনার স্তুপ'।

'কল্লোল' নাটকটার ছক কিন্তু আগেই উৎপল দত্তর কাটা ছিল। তখন নাটকে এই সব পারিবারিক বিষয় নিয়ে লেখাটা হয়নি। সে তখন নৌ-বিদ্রোহ আর স্বাধীনতা সংগ্রামটা নিয়েই লিখছিল। তাও পুরোপুরি লেখা

হয়নি— তবে খসড়াটা তৈরি ছিল। আমরা এই সময়ে ভাবছিলাম কী নাটক করা যায়। উৎপল তখন রাজনৈতিক ভাবে খুব সক্রিয়—সামনের সারিতে। প্রায় জননেতা হিসেবেই উঠে এসেছে। তখন এই নাটকটাই আমরা লুফে নিলাম। ওকে সময় দিলাম, বললাম, তুমি লিখে শেষ করো। আমরা তখন আর একটা জিনিস করতাম। যেমন 'অঙ্গার' নাটকের আগে একটা টিম নিয়ে উৎপল নিজে কয়লাখনির নিচে গেছে। সেখানে পুরো বিষয়টা সরেজমিনে দেখে, তারপর চরিত্র তৈরি করেছে এবং নাটক লিখেছে। তেমনি 'কল্লোল' লেখার সময় সম্পূর্ণ ইতিহাস দেখে, কিছু নৌ-বিদ্রোহের নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের ইতিহাস জেনে বই পড়ে তথ্যকে ভিত্তি করে লিখে ফেলে। উৎপলের সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই। এই যে 'কল্লোল'-এ নাবিকদের পোষাক, সে একেবারে নাবিকদের ডেকে, দেখে যারা নৌ-বিদ্রোহে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে তবে সে প্রত্যেকটি জিনিস করতো। আমাদের যিনি দর্জি হিসেবে এসেছিলেন, সেই রসিদ সাহেব, তিনিও ঐ সব পোষাক দেখে-শুনে, তাদের পোষাকের ওপরে যে ল্যাপেলগুলো থাকতো, সেগুলো পর্যন্ত সব একেবারে নিখুঁত করে করা হয়েছিল। পোষাকের দুটো সেট করা হতো—কারণ প্রথম দিকে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ভালো পোষাক। কিন্তু নৌ-বিদ্রোহের শেষের দিকটা, যখন সেই গুলি গোলা চলতে শুরু হয়েছে, তখন পোষাক হয়ে। যাবে ছেঁড়া, পোড়া। সেই জন্য আর এক সেট।

আমাদের 'কল্লোল' নিয়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। শাসক শ্রেণী তখন আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে দিয়েছে। উৎপলকে তারা জেলে পুরে দেয়। ওরা ভাবলো যে উৎপলকে জেলে পুরলেই নাটক বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের ধারণা উৎপলের পরে এমন কেউ আর নেই, যে সংগ্রামটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু উৎপল তার দলকে এমনভাবে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল যে কেউই ঘাবড়ালো না। কত রকম হুমকি, ফোন আসতো আমাদের কাছে, বিরোধিতাও আসতো। আমরা স্টার' থিয়েটার বুক করে নাটক করতে যাবো, শুনলাম তার আগেই থিয়েটার হলের উপর হামলা হয়েছে। আরও সংগ্রামের জন্য আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। (নাট্য দলের) প্রত্যেকটি সভ্য তার জন্য তৈরি ছিল। যখন যেই নাটকের জন্য যাচ্ছে, তখন বাধা দিচ্ছে। শাসক শ্রেণী যে কোনো উপায়ে আমাদের করতে দেবে না বলে স্থির করেছে। তারা তাদের সব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। পুলিশ কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ করছে না, সব কিছু দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু করছে না। তারা অপেক্ষা করছে আমি আর উৎপল সেখানে কতক্ষণে পৌঁছাবো। আমাদের মারধোর করে— আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়। অথচ সেইসময় পুরো পাবলিক আমাদের দিকে। তারা বলছে আমরা (গুণ্ডাদের) বাধা দেবো এবং এর বিরুদ্ধে লড়ে আমরা জিতব। আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যও এই মনোভাব নিয়ে লড়াই করেছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতলাম। 'কল্লোল চলছে, চলবে' শ্লোগান কার্যকর হল, 'কল্লোল' চললো এবং আমাদের প্রচণ্ড সুনাম হয়েছিল। সারা ভারতে, এমনকি বিদেশেও আমাদের সংগ্রামের কথা পৌঁছেছিল। এরপর আমাদের 'কল্লোল'-এর একটা বিজয়-উৎসব হয়েছিল—ময়দানে বিরাট করে হয়েছিল।

'তীর' নাটকের ক্ষেত্রেও একটা ঘটনা ঘটেছে। উৎপল বার বার গ্রেপ্তার হওয়ায় পারিবারিক দিক থেকে আমাকে মানসিক ভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে। মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে হয়েছে, দৃঢ়চেতা হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। যেমন স্টার থিয়েটার। যখনই উৎপল গাড়ি করে পৌঁছলো, ওমনি ওকে চারদিক থেকে ঘেরাও করল। ওখানে আমাদের লোকও ছিল। তারা আমাদের বললো, আপনারা শিগগির এখান থেকে সরে যান। আপনাদের ওপর এবার আক্রমণ আসবে। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। বললাম, আমরা (ওদের) ফেস করবো। সরে যাবো কেন! (আমাদের বন্ধুরা) বলল, না, এ ভুল করবেন না। আপনারা আর একটু শক্তি সংগ্রহ করে পরে লড়াইটা করুন।

তারপর আমাদের মিনার্ভা ছেড়ে দিতে হলো। এত আর্থিক দায় মাথায় নিয়ে আমরা চালাতে পারলাম না। প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আমাদের নামে লীজ, তাই সমস্ত (আর্থিক) দায়টাই উৎপলের ওপর পড়ল। (মিনার্ভা) ছেড়ে আমরা তখন বাইরে এসে শো করতে লাগলাম। ১৯৭১-৭২ থেকে। কিন্তু প্রথম

নাটকই হিট করে গেল—'টিনের তলোয়ার'। অসাধারণ একটি নাটক, যার মধ্যে কোনও পলিটিক্স ছিল না। বাংলা স্টেজকে নিয়ে একটা অসাধারণ নাটক লেখা হল।

'ব্যারিকেড' নাটকে আমার ভাগে যে চরিত্রটি ছিল তা অসাধারণ। উৎপল আমার জন্যই এই সব চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছিল। এইগুলো বাংলার নাটকের ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। আমাকে পরে অনেক অভিনেত্রীই বলেছেন, যেমন কেয়া চক্রবর্তী, তৃপ্তি ভাদুড়ি (তখন সে তৃপ্তি মিত্র হয়ে গেছে) বলেছে যে তুমি এত ভালো বিদেশি রোলগুলো করতে পারো, কেননা তুমি তো বিদেশে ঘুরেছো, দেখেছো এমনকি বিদেশি নাটকও দেখেছো।

আমি ব্রেখট পত্নী, হেলেনে ভাইগেল, তার সঙ্গে দেখা করেছি, কথাও বলেছি। সেটা এত একটা ইনসপায়ারিং ব্যাপার! তিনি ব্রেখটের সাথী ছিলেন, আমিও উৎপলের সাথী। তাকে দেখে আমার ইনসপিরেশনটা আসছে। সবাই তার ফিল্ম দেখে, আমি কিন্তু তাঁর নাটকে অভিনয় দেখেছি। স্টেজে তাঁকে দেখেছি। আমি তার বাড়িতে গেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার রান্নাঘর দেখেছি। উৎপলের যেমন খুব রসনা ছিল, ব্রেখটেরও নাকি তেমন প্রবল রসনা ছিল। হেলেনে অস্ট্রিয়ার মেয়ে, তিনি রান্না-বান্না খুব ভালো জানতেন। তাঁর রান্নাঘর অদ্ভুত সাজানো বাসন পত্র থেকে সব কিছু।

অনেকে ভাবে আমি খুব বড়োলোক, উৎপল দত্ত বুঝি (আমার জন্য) প্রচুর টাকা রেখে গেছে। আসলে (ব্যাপারটা) তা নয়। আমাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, আমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে।

-'অনীক', নভেম্বর, ২০১৭